জগদীশ চন্দ্র বসু বিশেষ সংখ্যা

ডিসেম্বর '৮৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অস্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

১৯৮৪ শিক্ষাবর্ষের

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সেরা বই

প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত

সাহিত্য পরিচয় (১ম) ষষ্ঠ

দক্ষিণারঞ্জন বসু সম্পাদিত

কাহিনী পরিচয় (১ম) ষষ্ঠ

কাহিনী পরিচয় (২য়) ৭ম

নীলোৎপল শ্যাম প্রণীত

ভূগোল পরিচয় ১ম (ষষ্ঠ)

ভূগোল পরিচয় ২য় (সপ্তম)

ভূগোল পরিচয় ৮ম—অধ্যাপক নীরেন সেন

জহরলাল গুহ ও নীরেন সেন প্রণীত

মাধ্যমিক ভূগোল—১ম-নবম (অনুমোদিত)

মাধ্যমিক ভূগোল—২য়-দশম

Prof. D. Banerjee & B. Ghosh M. A.

LEARN ENGLISH (V & VI)

Desk work & Grammar

ইতিবৃত্তিকা (সপ্তম ও অষ্টম)

—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক তারাচাঁদ নন্দী; অধ্যাপক সতীনাথ সেন,

ডঃ বলেন নন্দী প্রণীত

মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান ১ম (নবম)

মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান ২য় (দশম)

অধ্যাপক দীপক নন্দী ও শকুন্তলা নন্দী,

প্রাণী ও প্রকৃতি পরিচয় ১ম ষষ্ঠ

প্রাণী ও প্রকৃতি পরিচয় ২য় সপ্তম

দুলাল বসু

বিজ্ঞান-পরিচয় ৭ম, ৮ম

(সর্বাধুনিক তথ্য সম্বলিত)

অখিল নিয়োগী সম্পাদিত

স্বপন বুড়োর বুক অফ নলেজ

নমুনা কপির জন্য লিখুন

দি পাইওনীয়ার পাবলিকেশনস্

ও

শৈব্যা পুস্তকালয়

৮/১সি, এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট-কলকাতা-৭৩

১৯৮৪ শিক্ষাবর্ষের

প্রাথমিক ও কিণ্ডার গার্টেনের বই

বর্ণপরিচয় (১ম) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

খেলার সাথী—যোগীন্দ্র নাথ সরকার

কথামালার গল্প—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এক দুই তিন—দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ণপরিচয় (২য়)—ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর

রাঙ্গাছবি—যোগীন্দ্রনাথ সরকার

ছবিতে রামায়ণ—খগেন্দ্র মিত্র

কচিমুখের ছড়া—প্রেমেন্দ্র মিত্র

কচ্ছপ ও ঈগল পক্ষী—ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর

অঙ্কের মজা—অমর নাথ রায়

প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীর মূল্যায়ণ (১ম)

—বঙ্কিম চক্রবর্তী

প্রশ্নোত্তরে শিশু ব্যাকরণ ও রচনা—সুকান্ত পণ্ডিত

ছবিতে খেলাধুলা ও কর্মশিক্ষা (১ম)

—পুষ্পেন সরকার

স্বপন বুড়োর ছবিতে সাধারণ জ্ঞান (১ম)

—অখিল নিয়োগী

ছবিতে মহাভারত—খগেন্দ্র মিত্র

Habit of English (I)—Roy & Reeves

Nursery Rhymes—Bal & Reeves

প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীর মূল্যায়ণ (২য়)

—বঙ্কিম চক্রবর্তী

প্রশ্নোত্তরে শিশু ব্যাকরণ ও রচনা—সুকান্তপণ্ডিত

ছবিতে খেলাধুলা ও কর্ম শিক্ষা (২য়)

—পুষ্পেন সরকার

ছবিতে সাধারণ জ্ঞান (২য়)—অখিল নিয়োগী

ছবিতে মহাভারত—খগেন্দ্র মিত্র

সিংহ ও শৃগাল—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

Habit of English (II)—Roy & Reeves

Nursery Rhymes—Bal & Reeves

প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীর মূল্যায়ণ (৩)

—বঙ্কিম চক্রবর্তী

ছবিতে খেলাধুলা ও কর্ম শিক্ষা (২)

—পুষ্পেন সরকার

স্বপন বুড়োর ছবিতে সাধারণ জ্ঞান

—অখিল নিয়োগী

এই বাংলার ছেলে—মণি বাগচী

Habit nf English (III)—Roy & Reeves

Learn more words—Roy & Reeves

নমুনা কপির জন্য লিখুন

রঞ্জন প্রকাশন

৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭৩

আচার্য জগদীশচন্দ্র

সমরজিৎ কর

বড় মানুষদের নিয়ে এই হয় বিপদ। তোমরা তো ছেলেমানুষ। যাঁরা বয়েসে বড় এবং শিক্ষিতও, পৃথিবীর বিখ্যাত মানুষদের সম্পর্কে তাঁরাও মাঝে মাঝে এমন অজ্ঞতার পরিচয় দেন, ভাবা যায় না। হয়ত কাউকে জিজ্ঞেস করলে, বলুন তো, পরমাণু বোমা কে আবিষ্কার করেছেন? অমনি উত্তর হল, কেন? অটোহান? অথবা জিজ্ঞেস করলে, বার্ণাহার্ড নোবেল কেন বিখ্যাত? তার উত্তর হল, এ কথা কে আর না জানে? তিনি ডিনামাইট আবিষ্কার করে বিখ্যাত হয়েছেন। অথচ মজার ব্যাপার এই, অটো হান মোটেই পরমাণু বোমার আবিষ্কারক নন। তিনি বিখ্যাত হন ইউরেনিয়াম-235 পরমাণুর বিভাজন ঘটিয়ে। আর বার্ণাহার্ড নোবেল? ডিনামাইট আগেই তৈরি হয়েছিল। তাঁর বাবারই ছিল ডিনামাইটের কারখানা। বার্ণাহার্ড লক্ষ্য করেছিলেন, ডিনামাইটে বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহার করা হয় নাইট্রোগ্লিসারিন নামে এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ। অত্যন্ত বিস্ফোরক। তিনি লক্ষ্য করলেন, এই বস্তুটি বহন করাই একটা বড় রকমের সমস্যা। এতটুকু অসতর্ক হলে নাইট্রোগ্লিসারিন পূর্ণ ডিনামাইটে প্রায়ই বিস্ফোরণ ঘটে। তাতে মারা যায় অনেকে। তিনি আবিষ্কার করলেন, যদি সাজিমাটি অথবা কাঠের খণ্ডের সঙ্গে নাইট্রোগ্লিসারিন মিশিয়ে রাখা যায়, বিস্ফোরণের সম্ভাবনা কম থাকে। ডিনামাইটের সংস্কার সাধনও করলেন তিনি। তাঁর এই আবিষ্কার খনি শ্রমিকদের জীবনে নিরাপত্তা আনলো। মানব কল্যাণে এই মহৎ অবদানই তাঁকে পৃথিবী বিখ্যাত করে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রসঙ্গেই এই সব কথা বলছি। কারণ তাঁর সম্পর্কেও আমাদের অনেকের মনে একটা ভ্রান্তি রয়েছে। যদি প্রশ্ন করা হয়, তিনি কেন বিখ্যাত? এর উত্তরে এখনো অনেকের মুখেই শোনা যায়, সেকি? জানেন না, তিনি যে গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছেন? অথচ অনেকেই তোমরা জান, এ কথা তাঁর আগেই অনেকে জানতেন।

শিশু বয়েসেই জগদীশচন্দ্রের মধ্যে দেখা গিয়েছিল প্রকৃতির প্রতি অসাধারণ ভালবাসা। গাছপালা তিনি ভালবাসতেন। ভালবাসতেন প্রাণীদের। কীটপতঙ্গ সংগ্রহ করা ছিল শখ। সংগ্রহ করতেন নানা রকম মাছ। কখনো সাপ। প্রাণীদের প্রতি তাঁর এমন আগ্রহের কথা ভাবলে মনে হয় তাঁর প্রাণীবিজ্ঞানীই তো হওয়ার কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পদার্থবিজ্ঞান নিয়েই তাঁকে শুরু করতে হল বিজ্ঞানী জীবন। এর কারণ হয়ত এই, তাঁর পাঠ্য-

আচার্য জগদীশচন্দ্র

কালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীবিজ্ঞান পড়ানোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। আর তখনই তিনি কাছে পেলেন এমন একজন মানুষ, যিনি মুহূর্তে তাঁর মনকে পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করতে সমর্থ হন। যাঁর কথা বলছি, তাঁর নাম ফাদার লাফোঁ। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক।

ব্যাপারটা ললাট লিখনেরই মত।

বাবা ভগবানচন্দ্র বসু এসেছিলেন ফরিদপুরে (বর্তমানের বাঙ্গলা দেশে) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে। এ শহরে তখন দুটি স্কুল। একটি ইংরেজী, অপরটি বাংলা। এই দ্বিতীয় স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বয়ং ভগবানচন্দ্র। পুত্র জগদীশচন্দ্রকে তিনি এই স্কুলেই ভর্তি করেন। কারণ তিনি মনে করতেন, দেশের সংস্কৃতি এবং জন মনের জন্যে পরিচয় পেতে হলে শিক্ষা মাতৃ ভাষার মাধ্যমেই হওয়া উচিৎ। ফলে জগদীশচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষার বুনিয়াদ তৈরি হল মাতৃ ভাষায়। এর পর মাস তিনেক পড়েছিলেন কলকাতার হেয়ার স্কুলে। পরে ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। এখান থেকেই 1875 সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে ভর্তি হন এখানকার কলেজ বিভাগে। ফাদার লাফোঁ তখন এই কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের বিখ্যাত অধ্যাপক। যেমন পণ্ডিত, তেমন

বাগ্মী। তাঁর সহজ সরল ভাষা এবং হাতে কলমে পরীক্ষার গুনে পদার্থ বিজ্ঞানের জটিল বিষয় বস্তু হয়ে উঠত প্রাণবন্ত। হৃদয় গ্রাহী। তরুণ জগদীশচন্দ্রের মনে তা গভীরভাবে রেখাপাত করে।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বিজ্ঞানে বি. এ পাশ করে জগদীশচন্দ্র গেলেন লণ্ডনে। ঠিক হয় চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়বেন সেখানে। কিন্তু শারীরবিজ্ঞানের ক্লাসে গিয়ে শব-ব্যবচ্ছেদ কক্ষের দুর্গন্ধ তাঁর কাছে অসহণীয় হয়ে উঠল। অসুস্থও হয়ে পড়লেন তিনি। অধ্যাপকের পরামর্শে শারীর বিজ্ঞান তাঁকে ছাড়তে হল।

নিরুৎসাহ হলেন না। লণ্ডন থেকে চলে গেলেন কেমব্রিজে। এখানে এসে তিনি শারীবৃত্ত, ভূততত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং উদ্ভিদ বিদ্যায় অনুশীলন করলেন প্রখ্যাত অধ্যাপকদের কাছে। তিন বছর অধ্যায়ন করার পর এখান থেকে প্রকৃতি বিজ্ঞানে তিনি ট্রাইপোস পাশ করেন। কিছুদিন পর বি. এস সি পাশ করেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিবিধ বিষয় অধ্যায়নের দরুন জগদীশচন্দ্রের মানসিকতায় যথেষ্ট বিস্তৃতি ঘটে। এর জন্যেই পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

অতঃপর বিজ্ঞানী জীবনের শুরু। প্রথমে পদার্থবিজ্ঞানে।

জানো তো, মানুষ এক এক সময়ে এক একটি বিষয় নিয়ে কেমন হৈ চৈ করে? দুর্গা পুজোয় হৈ চৈ; কালী পুজোয় হৈ চৈ। কোথাও মেলা হল তা নিয়ে হৈ চৈ। বিজ্ঞানীদের মধ্যেও এক এক সময় এক একটি বিষয় নিয়ে হৈ চৈ করতে দেখা যায়। যেমন ধরো, ডারউইন যখন জৈবিক বিবর্তন তত্ত্ব তুলে ধরলেন, সারা পৃথিবীর জীব-বিজ্ঞানীরা তা নিয়ে উঠে পড়ে লাগল। এক সময় পারমাণবিক বিভাজন এবং তেজস্ক্রিয়তা নিয়েই না কত হৈ চৈ। এখন তোলপাড় চলছে ডি এন এ, আর এন এ নিয়ে। জগদীশচন্দ্র যখন বি এস সি পাশ করলেন তখন পদার্থ বিজ্ঞানী তোলপাড় করছেন একটি তত্ত্ব নিয়ে —যার নাম ম্যাকসওয়েলের তড়িৎ-চৌম্বক তত্ত্ব। এ তত্ত্বে বলা হল, বিদ্যুৎ পরিবাহীর মধ্যে বিদ্যুৎশক্তি স্পন্দিত হলে পরিবাহীর চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে এক ধরনের তরঙ্গ, যাকে বলা হয় বিদ্যুৎ-তরঙ্গ। বাতাস বা যে কোন অপরিবাহী মাধ্যমের ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর যখন ছড়ায়, তার গতি দাঁড়ায় আলোর গতির সমান।

শুরু হল হৈ চৈ। তরঙ্গ যদি আলোক তরঙ্গের সমগোত্রীয় হয়, তা হলে আলোক তরঙ্গের যা যা ধর্ম, সে সব ধর্ম বিদ্যুৎ-তরঙ্গেরও তো থাকার কথা। আলোর মত এই তরঙ্গের প্রতিফলন, প্রতিসরণ, বিচ্ছুরণ, সমবর্তন বা পোলেরাইজেশন পরিলক্ষিত হওয়ার কথা। মুশকিল হল, আলোর এ সব ধর্ম ছোট আকারের সাজ সরঞ্জাম দিয়েই প্রমাণ করা যায়। আলোর প্রতিসরণ প্রমাণ করাব? ছোট্ট একটি কাচের প্রিজম হলেই হল। কিন্তু বিদ্যুৎ-তরঙ্গের। ম্যাকসওয়েলের কথা মত দৈর্ঘ অনেক বড়। তার ক্ষেত্রে প্রতিসরণ প্রমাণ করতে গেলে চাই বেশ বড় আকারের প্রিজম। অত বড় প্রিজম তৈরী করাই শক্ত। বিদেশে এ নিয়ে অনেকেই পরীক্ষা করছিলেন। ভারতে পরীক্ষায় হাত দিলেন জগদীশ চন্দ্র। আর তা করতে গিয়ে ঘটালেন অদ্ভুত ঘটনা।

তিনি ভাবলেন, বিদ্যুৎ-তরঙ্গের দৈর্ঘ কম করলেই তো আর বড় প্রিজম দরকার হয় না। এবং শেষ পর্যন্ত তৈরি করলেন ৫ থেকে ৩ মিলিমিটার দৈর্ঘের তরঙ্গ। এত ক্ষুদ্র দৈর্ঘের বিদ্যুৎ তরঙ্গ পৃথিবীতে জগদীশ চন্দ্রই প্রথম তৈরি করলেন। যাকে তোমরা মাইক্রোওয়েভ বলে জান, এ তাই। এই গবেষণার দরুণ লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁকে ডি. এস. সি. উপাধিতে ভূষিত করেন। গবেষণার বিষয় ছিল বিদ্যুৎ-তরঙ্গের দৈর্ঘ নির্ণয়।

এর পর একে একে কত রকম বিষয় নিয়েই না তাঁর কাজ। এখন তোমরা মুখে মুখে সেমি কনডাকটারের কথা শোন। গ্যালেনা (সিসের সালফায়েড) এক ধরনের সেমিকনডাকটার। তিনিই পৃথিবীতে প্রথম বেতার তরঙ্গের গ্রাহক হিসেবে গ্যালেনার কেলাস ব্যবহার করেন। প্রাণী অথবা উদ্ভিদের মত জড় পদার্থও যে পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়, আবার বিশ্রাম পেলেই ক্লান্তি দূর হয়, এ তথ্যও পৃথিবীতে প্রথম প্রমাণ করেছেন জগদীশ চন্দ্র। এখন আধুনিক বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদ্‌দের কাছে এটা বড় রকমের গবেষণার বিষয়। যে সব উদ্দীপনা প্রাণী এবং উদ্ভিদকে চঞ্চল করে তোলে, তারা জড় বস্তুর মধ্যেও সৃষ্টি করে চঞ্চল্য। বিষ উদ্ভিদ, প্রাণী এবং জড় বস্তুর মধ্যেও সমরূপ ঘটনা ঘটায়। বিষ প্রয়োগে প্রাণীদের মধ্যে মৃত্যুর যে সব লক্ষণ একে একে ফুটে ওঠে, উদ্ভিদের মধ্যেও ওঠে। এখন তোমরা 'বাইওফিজিকস' নামে এক ধরনের বিজ্ঞানের কথা শুনছ। বিভিন্ন ভৌতিক বিষয় —আলো, উত্তাপ, শব্দ, চাপ, বল প্রভৃতি জীব জগতের উপর কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে—এ সবই 'বাইও-ফিজিকস' বা ভৌতজীববিদ্যার বিষয় বস্তু। জগদীশ-চন্দ্রের সময় এ নিয়ে তেমন চর্চা হত না। অথচ তাঁর গবেষণাগারে 'লজ্জাবতী' প্রভৃতি উদ্ভিদ নিয়ে কত ভাবেই না গবেষণা করেছেন তিনি।

বর্তমান সংখ্যায় জীগদীশচন্দ্রের জীবন এবং গবেষণার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন বিভিন্ন লেখক। আশা করি, তাঁদের রচনা ভারতের অগ্রজতম এই বিজ্ঞানী সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা যোগাতে সমর্থ হবে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র

অন্নদাশঙ্কর রায়

পনেরো বছর বয়সে 'প্রবাসী'র গ্রাহক হয়ে আমি প্রথমে যে সংখ্যাটি পাই সেটির গোড়াতেই দেখি আচার্য জগদীশ-চন্দ্রের রচিত প্রবন্ধ। স্বচ্ছন্দ, সুখপাঠ্য ভাষা। বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। এক নিঃশ্বাসে পড়ি। গোটা কতক ছবিও ছিল তার সঙ্গে। তাঁর উদভাবিত যন্ত্রপাতির ও গাছপালার পাতার ছবি। প্রবন্ধের শিরোনামা মনে নেই। বিষয়টিও যে মনে আছে তা নয়। থাকবে কি করে? মাঝখানে কেটে গেছে চৌষট্টি বছর। সালটা ছিল ১৩২৬। পরের বছর আমার নিজের লেখা 'প্রবাসীতে' বেরয়। টলস্টয়ের একটি উপকথার অনুবাদ।

এতকাল পরেও মনে আছে আচার্যদেবের একটি কথা। তাঁর যন্ত্রগুলির নাম তিনি স্বদেশী ভাষা সংস্কৃততেই রেখে-ছিলেন, কিন্তু বিদেশে নিয়ে গিয়ে বক্তৃতার সময় প্রদর্শন করতে গিয়ে হাস্যকর পরিস্থিতিতে পড়েন। ইংরেজদের মুখে 'কুণ্ডনম্যান' হয়ে যায় 'কাণ্ডনম্যান' আর 'বর্ধমান' বনে যায় 'বার্ডম্যান'। অগত্যা আন্তর্জাতিক রীতি অনুসারে ল্যাটিন-ভাষায় নামকরণ করতে হয়।

এর বছর পাঁচ ছয় পরে আমি যখন পাটনা কলেজের ছাত্র তখন একদিন কলেজের জিমনেসিয়ামে আচার্য দেবের ইংরেজী বক্তৃতা শুনি। সাথে ছিলেন আচার্যপত্নী লেডী অবলা বসু। তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে বলার পরে তিনি দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে দুচার কথা বলেন। বেশ মনে আছে তিনি ভোকেশনাল এডুকেশনের উপরে জোর দেন। অ্যাকা-ডেমিকের উপরে সকলের ঝোঁক তাঁর পছন্দ নয়। তখন সেটা আমার মনে ধরেনি। এখন আমিও তাঁর সাথে একমত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রেরও সেই মত ছিল।

আচার্য জগদীশচন্দ্রকে তার পরে আর আমি দেখিনি। তাঁর বাংলা রচনাও আর আমার চোখে পড়েনি। 'অব্যক্ত' নামে তাঁর একখানি প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। সে বই আমার অপঠিত। কোন উদ্যোগী প্রকাশক কি সেটা পুনঃ-প্রকাশ করতে পারেন না?

পদার্থবিদ্ জগদীশচন্দ্র

বিমলেন্দু মিত্র

গত 30 শে নভেম্বর তারিখে আমরা জগদীশচন্দ্র বসুর 125 তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছি। তোমরা জানলে খুশি হবে যে গত বছরে বিলেতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি প্রদর্শনী হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ সেই প্রদর্শনীতে জগদীশচন্দ্রের নিজের তৈরী কিছু কিছু আশ্চর্য যন্ত্রপাতি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, অবাকও হয়েছেন। প্রায় নব্বই বছর আগে জগদীশচন্দ্র যে কলেজে পড়াতেন, সেই প্রেসিডেন্সী কলেজের এক সামান্য টিনমিস্ত্রীকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে তাকে দিয়ে নিজের পরিকল্পনামত যে সব যন্ত্র তৈরি করেছিলেন, তা আজকের বিজ্ঞানীদেরও অবাক করে দেয়। কি সেই সব যন্ত্র? কি সেইসব কাজ, যা একদা জগদীশচন্দ্রকে পৃথিবী বিখ্যাত করেছিল? স্বভাবতই তোমাদের অনেকের কাছে, এমন কি অনেক শিক্ষিত বয়স্ক লোকেদের কাছেও এসব প্রশ্নের ভালমত জবাব আজও নেই। তাই আজও, এমনকি অনেক মাস্টারমশাইদের কাছেও প্রশ্নের জবাবে শুনতে পাই, —(১) জগদীশচন্দ্র মার্কোনির আগেই রেডিও আবিষ্কার করেছিলেন, আর (২) জগদীশচন্দ্র গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন। এক কথায় বলে রাখি, প্রথম জবাবটি যে অর্থে বলা, তা ঠিক নয়, আর দ্বিতীয়টি একেবারেই ভুল। গাছেরও জীবন আছে এ তথ্যে অন্তত দু এক হাজার বছর আগেও কেউ সন্দেহ জানায়নি। এমনকি উপনিষদের ঋষিরাও না। তবে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে কেন আমরা আমাদের দেশের আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণার পথিকৃৎ বা প্রথম পথ প্রদর্শক বলে থাকি? কেন একমাত্র জগদীশচন্দ্রকেই পশ্চিমী বিজ্ঞানীরা সসম্মানে তাঁদের সমান বলে মেনে নিয়েছিলেন? কোলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে মোটামুটি ভালভাবে বি-এ পাশ করলেও জগদীশ তখন যে খুব একটা নামডাকওয়ালা ছাত্র ছিলেন তা নয়। তবে তাঁর মধ্যে অদম্য ইচ্ছাশক্তি যে ছিল তা তাঁর প্রথম জীবনের কয়েকটা ঘটনায় বোঝা যায়। তাঁর জীবনকাহিনী আজ আমরা বলতে বসিনি, যদিও তারও আলাদা আকর্ষণ অস্বীকার করবার উপায় নেই। আর মাসে মাসে চিত্রকাহিনী তো তোমরা পেয়েছই, জগদীশের জীবনী জানবার উদ্দেশ্যেই যার অবতারণা। আজ বরং ওপরে বলা প্রথম ছোট্ট প্রশ্নটির জবাব কেন বেশির ভাগ মানুষের ঠিকমত জানা সেই আলোচনাই করি। সেই আলোচনা করতে গেলেই পদার্থবিদ জগদীশচন্দ্রের পদার্থতত্ত্বের যুগান্তকারী গবেষণা-টবেষণার কথা বলা হয়ে যাবে।

লণ্ডনে ডাক্তারী পড়তে গেলেও কালাজ্বরে ভোগান্তির ফলে শরীর খারাপ হয়ে যাওয়ায় সাহেব মাস্টার মশাইদের পরামর্শে জগদীশ যখন বিজ্ঞান পড়তে কেমব্রিজে এসে ভর্তি হলেন, তখনও কিন্তু জগদীশের আকর্ষণ মোটামুটি শারীরবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, এসব বিষয়ের দিকেই বেশি। কিন্তু এই সেই কেমব্রিজ, যেখানে আছে ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরি, যেখানে মাস্টারমশাইদের মধ্যে রয়েছেন তখন বিখ্যাত পদার্থতাত্ত্বিক লর্ড র‍্যালে। এই সেই কেমব্রিজ, যেখানে মাত্র কয়েক বছর আগেই প্রধান অধ্যাপক ছিলেন জেম্‌স্ ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌ওয়েল।

ম্যাক্‌স্‌ওয়েল আলোর নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। তখনকার দিনে নোবেল প্রাইজ ছিল না, তাই ম্যাক্‌স্‌ওয়েল নোবেল প্রাইজ পাননি, (যেমন পাননি নিউটন)! কিন্তু ম্যাক্‌স্‌ওয়েলের নিজের ভাষায় তাঁর তত্ত্ব হল - "Great guns!" বিপুল সাড়া জাগানে তত্ত্ব! আগেই জানা ছিল যে আলো হল এক ধরনের ঢেউ বা তরঙ্গ,— ঠিক যেমন ঢেউ ওঠে পুকুরে ঢিল ফেললে। মনে করা হত', বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অদেখা অধরা এক অজানা চরিত্রের স্থিতিস্থাপক বস্তু—যার নাম 'ইথার', তার মধ্যে ডুবে আছে আর আলোর ঢেউ 'ইথারকেই' কাঁপিয়ে চলাচল করে, যেমন জলের ঢেউ কাঁপায় জলকে। কিন্তু কোন সেই ভৌতবস্তু যা নিজে কেঁপে তবে ইথারকে কাঁপায়? ম্যাকস্‌ওয়েল বললেন,—তা হল বিদ্যুৎশক্তি আর চৌম্বকশক্তির 'যুগ্ম', 'ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটিক' এনার্জি। অঙ্ক কষে পেলেন,— বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গ সাধারণ আলোর বেগেই চলাফেরা করে; শুধু তাই নয়, সাধারণ আলোও বিদ্যুৎশক্তি আর চৌম্বকশক্তির যৌথ কাঁপনের ফলেই জন্মায়! একথা মানব কি করে, যদি না 'বিদ্যুৎ-আধান' আর 'চৌম্বক-মেরু', এদুটিকে সত্যি সত্যিই কাঁপিয়ে দিয়ে 'আলো'র জন্ম হচ্ছে, তা দেখতে পাই?

সেই কাজ করলেন জার্মানীর কার্লশ্রুহে শহরে এক অদ্ভুতকর্মা তরুণ বিজ্ঞানী, হাইনরিষ্ হার্ৎজ্। তিনি দেখালেন সত্যিই 'লাইডেনজার' নামের যন্ত্রের মাথায় বিদ্যুতাধান জমা হয়ে যখন স্পার্ক বা স্ফুলিঙ্গ দেয় তখন বিদ্যুৎ চৌম্বক শক্তিই 'ঢেউ' এর আকারে ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক আলোর ঢেউ এর মতই তার ধর্ম,—তার প্রতিফলন প্রতিসরণ ইত্যাদি আলোর ঢেউ এর নিয়ম মেনেই ঘটে। অবশ্য এই 'আলো' চোখে দেখা গেল না। ঢেউ ধরবার বিশেল যন্ত্রে ধরা পড়ল। ঐ ঢেউ-ই তো প্রথম অদৃশ্য 'ইথার-তরঙ্গ' যার নাম হল 'রেডিও-ওয়েভ্স্'। সুতরাং 'রেডিও'র প্রথম আবিষ্কর্তা হাইনরিষ্ হার্ৎজ্! তবে জগদীশচন্দ্র? সে কথায় আসছি।

চোখে যে আলো আমরা দেখি তার ঢেউ এর মাপ হল এক মিলিমিটারকে মোটামুটি দশহাজার ভাগ করলে তার পাঁচ ভাগ থেকে সাত ভাগ। বিদ্যুৎচৌম্বক ঢেউ চোখে ধরা পড়ল না তার কারণ তার ঢেউ এর মাপ হয় আরও ছোট অথবা আরও বড়।

হার্ৎজ নিজেই মেপেজুকে দেখলেন যে তাঁর তৈরি অদৃশ্য-তরঙ্গের ঢেউ এর মাপ হল প্রায় দশ মিটার। মানে তারা সাধারণ আলোর প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ গুণ বড়। তবুও তারাও সাধারণ আলোর গুণাগুণ মেনে যে চলে সে কথা হার্ৎজ্কে পরীক্ষা করে বোঝাতে হল। ফলে হার্ৎজ্কে কি অসুবিধেয় পড়তে হল তার দুএকটা উদাহরণ দেখলেই বোঝা যাবে। যেমন, প্রিজ্মের মধ্যে দিয়ে সাধারণ আলো গেলে তার যেমন বিচ্ছুরণ ঘটে, যার ফলে আমরা সূর্যের আলোকে সাত ভাগে আলাদা করতে পারি, তেমন একটি পরীক্ষা করতে গিয়ে যে বিরাট প্রিজ্ম্ তাঁকে ব্যবহার করতে হল তার মাপ...

হার্ৎজ্ খুব অল্প বয়সে মারা যান। কিন্তু বিজ্ঞানের জগতে তিনি যে সাড়া জাগিয়ে গেলেন তা সামান্য নয়। আলট্রাভায়োলেট বা ইনফ্রারেড আলোও অদৃশ্য আলো, কিন্তু তাদের ঢেউ এর মাপ সাধারণ আলোর ঢেউ এর মাপের সামান্যই কম বেশি। হার্ৎজের কাজের ফলে এই প্রথম মানুষ অনুভব করল যে বিশ্বে আরও বহু বহুগুণ বড় মাপের ঢেউ এর জন্ম সম্ভব। এই অদৃশ্য আলো মানুষকে খুব ভাবিয়ে তুলল। তাহলে সাধারণ আলো আর তার চেয়ে বহু কোটি গুণ বড় মাপের 'আলো' যা পাওয়া গেল, তার মধ্যেকার আকাশ পাতাল ব্যবধান হয়ত শূন্য নয়, হয়তো সব রকম মাপের আলোই মহাবিশ্বে রয়েছে বা তাদের সৃষ্টি করা সম্ভব। হার্ৎজের মৃত্যুর পরে এই কাজ করতে এগিয়ে এলেন আরও অনেক বিজ্ঞানী; পৃথিবীর নানান দেশে তাঁদের বাস। তাঁদের মধ্যে খুব নাম করবার মত যাঁরা, তাঁরা হলেন ইংলণ্ডের স্যার অলিভার লজ ও ফ্লেমিং, ইতালীর অধ্যাপক রিঘি, ফরাসী দেশের ব্রাঁলি, রাশিয়ার পপভ প্রভৃতি। ওঁদের চেষ্টা হল, সাধারণ আলো আর হার্ৎজের ঐ প্রকাণ্ড যে 'রেডিও'-তরঙ্গ, তাদের মাঝামাঝি বিভিন্ন মাপের ঢেউ এর সৃষ্টি করবার, তাদের উপস্থিতি বোঝাবার এবং তাদের নানা ধর্মাধর্ম জানবার জন্যে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরির। তখনকার পরাধীন, বিজ্ঞানে অজ্ঞ, পিছিয়ে থাকা আমাদের ভারতবর্ষে কিন্তু ঐ একটি মানুষ এগিয়ে এলেন, এদেশে থেকেও পৃথিবীর ঐ প্রথম সারির বিজ্ঞানী-দের তখনকার সর্বপ্রধান ঐ গবেষণার কাজের সঙ্গে সমান তালে পা মিলিয়ে চলবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে। এদেশের আবহাওয়াতে তখন বিজ্ঞান গবেষণার কোনও আভাসমাত্রও নেই। কিছু দেশী পণ্ডিত সবে ডাক্তারী পড়ে ডাক্তার হয়েছেন, আর একমাত্র প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিলেতের এডিনবরা থেকে রসায়ন বিদ্যায় গবেষণা করে ডিগ্রী নিয়ে এসে প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্র পড়াচ্ছেন।

ছোট মাপের অদৃশ্য বেতার-তরঙ্গ তৈরি করা যায় কিনা সেই কাজে জগদীশচন্দ্র লেগে গেলেন; সে হল 1894 সাল। তখনও আলোর মাপের চেয়ে অনেকগুণ ছোট অদৃশ্য এক্স-রে'র ঢেউ এর কথা কেউ জানত না, কারণ এক্সরের জন্ম হয় নি। তখন ইলেকট্রনের আবিষ্কারও হয়নি। আবিষ্কার হয়নি তেজস্ক্রিয় পদার্থ রেডিয়ামের। অর্থাৎ বিজ্ঞানের নতুন যুগ শুরু হয়নি।

কিন্তু, কোলকাতায় বসে, খুব ছোট মাপের বেতার-তরঙ্গ সৃষ্টির কাজে জগদীশচন্দ্র আশ্চর্য রকমের সফল হলেন। তিনি যে অদৃশ্য বিদ্যুৎ চৌম্বক রশ্মি সৃষ্টি করতে পারলেন তার মাপ মাত্র 5 মিলিমিটার। হার্ৎজের বেতার-তরঙ্গের মাপ ছিল প্রথমত প্রায় দশ মিটার। (পরে অবশ্য হার্ৎজ্ নিজেই 66 সেণ্টিমিটার মাপের ঢেউ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন)। এই ছোট্ট তরঙ্গটির জন্মদান করতে, তাকে যন্ত্রপাতির সাহায্যে মাপজোক করতে বা ঐ তরঙ্গ দিয়ে নানারকমের পরীক্ষা করতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র যে আশ্চর্য নতুন কারিগরির গোড়াপত্তন করলেন, তার গুরুত্বটুকুও আমরা অনেকদিন যাবৎ বুঝতে পারিনি। সে কথায় পরে আসছি।

সম্ভবত 1894 সালেই জগদীশচন্দ্র তাঁর এই কাজ শুরু করেন। মাত্র এক বছরের মধ্যেই, 1895 সালের মে মাসে তিনি ঐ ছোট্ট 'বিদ্যুৎ-ঢেউ' সৃষ্টির যন্ত্র ব্যবহার করে একেবারে পয়লা সারির গবেষণার ফলাফল জানালেন, এশিয়াটিক সোসাইটির একটি সভায়। বিষয়টা 5 মিলি-মিটার 'বিদ্যুৎ-রশ্মির' 'সমবর্তন'। আমি কখনও 'বিদ্যুৎ ঢেউ' বলছি, কখনও 'বিদ্যুৎ-রশ্মি' বলছি,—ব্যাপারটা

জেনে শুনেই করছি, কারণ জগদীশচন্দ্র একে Electric Ray বলেছেন। তিনি Ray বা রশ্মি একে বলতেই পারেন, কারণ তিনি তাঁর ঐ ছোট্ট মাপের ঢেউ গুলিকে তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি দিয়ে রশ্মিগুচ্ছের ('ray') মত নির্দিষ্ট দিকে পাঠাবার কলাকৌশল আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি পেরেছিলেন, ঐ 5 মিলিমিটার মাপের বিদ্যুৎ-ঢেউ আসলে হল আজকালকার চেনাজানা 'মাইক্রোওয়েভ' (Microwave)। জগদীশচন্দ্র ছিলেন দু-চারজন প্রথম 'মাইক্রোওয়েভ-ইঞ্জিনিয়ারদের' মধ্যে সবচেয়ে সফল ব্যক্তি।

আসলে মাইক্রোওয়েভকে নতুন করে আবিষ্কার করা হল গত দ্বিতীয় যুদ্ধের আমলে,—ইংলণ্ডে RADAR যন্ত্র আবিষ্কার হয় যুদ্ধেরই প্রয়োজন মেটাতে। জানাগেল, মাইক্রোওয়েভ খুব ছোট্ট মাপের ঢেউ হওয়ায় সেই অদৃশ্য রশ্মি বহু দূরে একদিক পানে পাঠানো যায়, বাধা পেলে এ রশ্মি প্রতিফলিত হয় ঠিক আলোরই মত,—প্রতিফলিত রশ্মিকেই প্রতিগ্রহণ করে দূরের আক্রমণকারী এরোপ্লেনের অস্তিত্ব ও দূরত্ব অন্ধকারেও বোঝা যেতে লাগল। Battale of Britain এ জার্মান আকাশ-হামলা রুখে দেওয়া গেল।

যুদ্ধের পরে মাইক্রোওয়েভের প্রভূত উন্নতি হল, ছোট্ট মাপের বিদ্যুৎ-ঢেউ ব্যবহার করে টেলিভিশন তৈরি করা গেল। মহাকাশ অভিযানও আজকে সফল হয়েছে প্রকৃতপক্ষে মাইক্রোওয়েভের কারিগরী বিদ্যার উন্নতি হবার ফলেই।

কিন্তু মাইক্রোওয়েভ কারিগরী তো নতুন জিনিস নয়! 1895-96 সালেই তার মূল প্রকৃতিগুলি জগদীশচন্দ্র, বা অলিভার লজ, বা রিঘি বা পপভ বুঝেছিলেন। জগদীশ চন্দ্র সবচেয়ে সফল হয়েছিলেন সবচেয়ে ছোট তরঙ্গ সৃষ্টির কাজে। আর তাই তিনিই সবচেয়ে ভালভাবে তাঁর 'রশ্মিকে' একদিক পানে পাঠাতে পেরেছিলেন। একদিক পানে পাঠান দরকার ছিল, কারণ এ ভাবেই শক্তিক্ষয় না করে ঢেউ এর সবটুকু শক্তি বহু দূরে পৌঁছতে পারে। এর জন্যে তিনি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন বিচিত্র রকমের 'ওয়েভ-গাইডের' (Wave guide)। তিনি অবশ্য নাম দিয়েছিলেন Collinator tube। তাঁর রশ্মি ধরবার কাজে যে যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন, তার সামনে লাগিয়েছিলেন collimating funnel যা বর্তমানের horn antenna ছাড়া কিছুই নয়!

এবারে আসি অন্য কথায় বা একেবারে গোড়ার কথায়। 1895 সালে জগদীশচন্দ্র তাঁর আশ্চর্য বিচিত্র যন্ত্রপাতি সাধারণের কাছে হাজির করলেন। 75 ফুট দূর থেকে বিনা তারে বিদ্যুৎ-সংকেত পাঠালেন আর তাই দিয়ে দূর থেকে বিনা তারে যন্ত্রপাতি নাড়ালেন,—বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক কাজ কর্ম তাহলে দূর থেকে করা সম্ভব হল 'রেডিও'-যুগের!

বেতারের সাহায্যে বিনা তারে সংবাদ পাঠানো যেতে পারে একথা কিন্তু জগদীশচন্দ্রই প্রথম ভেবেছিলেন। 1896 সালে জগদীশচন্দ্র যখন ইংলণ্ডে তখন তাঁর সঙ্গে Daily chronicle নামের পত্রিকার প্রতিনিধির কথাবার্তা হয়। প্রতিনিধি লিখলেন—"The inventor has transmitted signals to a distance of nearly a mile and herein lies the first and obvious and exceedingly valuable application of this new theoretical marvel. It is telegraphy without any kind of intervening conductor!" (Daily chronicle, 29 November, 1896)। অর্থাৎ,—"আবিষ্কর্তা (জগদীশচন্দ্র) প্রায় এক মাইল দূরে সংকেত পাঠাতে পেরেছেন। এতেই এই আবিষ্কারের প্রথম স্বাভাবিক আর মূল্যবান প্রয়োগ হয়েছে তা হল তারহীন টেলিগ্রাফ!"

জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে 'বিদ্যুৎ ঢেউ' পাঠিয়ে প্রায় এক মাইল দূরের নিজের বাড়িতে বসে তা ধরেছিলেন। সেই কথাই সম্ভবত Daily chronicle লিখেছে। প্রায় একই সময়ে, 1895 সালের শেষের দিকে পপভের একটি যন্ত্রের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এ যন্ত্র দিয়ে পপভ আকাশের বিদ্যুৎ সংকেতকে বিদ্যুৎ-ঢেউ ধরবার যন্ত্র দিয়ে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। 1895 সালের ডিসেম্বরে পপভ লিখছেন, (বাংলাতেই বলছি) "আমি আশা করি যে আমার যন্ত্রটি আর একটু ভাল করতে পারলে বিদ্যুৎ স্পন্দন ব্যবহার করে দূরে সংকেত পাঠান যাবে,—অবশ্য এজন্য আমাকে আরও জোরাল যন্ত্র তৈরি করতে হবে।" কিন্তু ততদিনে তো জগদীশচন্দ্র তাঁর যন্ত্রের পটুতা দেখিয়েই দিয়েছেন।

1896 সালের 2রা জুন মিনর মার্কোনি প্রথম ইংলণ্ডের পেটেন্ট অফিসে দরখাস্ত করলেন,—তাঁর "বিদ্যুৎস্পন্দন দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি ও সংকেত প্রেরণের" যন্ত্রের পেটেন্ট নেবার জন্যে। 1897 সালের মে মাসে তাঁকে আবার দরখাস্ত করতে হল, কারণ প্রথমটিতে ছবিটবি ঠিক ছিল না। 1897 সালের মে মাসেই মার্কোনি প্রায় 9 মাইল দূরে বেতার-সংকেত পাঠাতে পারলেন। সত্যিকারের রেডিও টেলিগ্রাফির তখনই সূচনা।

জগদীশচন্দ্র, অলিভার লজ, পপভ প্রভৃতি সকলেই কিন্তু ততদিনে ঐ কয়েক মিলিমিটার মাপের বিদ্যুৎ ঢেউ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন। মার্কোনিই প্রথম Microwaves এর গণ্ডি পার হয়ে বর্তমানের সার্টওয়েভ ব্যাণ্ডের ঢেউ ব্যবহার করেছিলেন। তারপরে হল রেডিওর

25 পাতায় শেষাংশ

জীবন বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ—14

তারকমোহন দাস

ডাঙ্গার ওপর বহু রকম উদ্ভিদ বাস করে। অসংখ্য সবুজ উদ্ভিদ। ডাঙ্গার উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের ক্ষেত্রে যে বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস অপরিহার্য সেটা দেখবার জন্য একটি পরীক্ষা করা যেতে পারে। একটি টবের সবুজ গাছকে একটি অন্ধকার ঘরে টব সমেত দুদিন রেখে দাও। একটি চওড়া মুখ যুক্ত কাঁচের বোতলে কিছু কষ্টিক পটাস দ্রবণ রাখ এবং বোতলের মুখটি মাপমত দুইভাগে বিভক্ত একটি কর্কের সাহায্যে বন্ধ কর। বোতলটি টেবিলে শুইয়ে রাখ। দুই দিন অন্ধকারে রাখা গাছটি থেকে একটি বোঁটা সমেত কচি পাতা ছিঁড়ে এনে পাতার সামনের অর্ধাংশটি কর্কের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বোতলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দাও, বাকি অর্ধাংশটি বোতলের বাইরে রাখ এবং বোঁটাটি একটি জল পূর্ণ পাত্রে ডুবিয়ে রাখ যাতে সালোকসংশ্লেষের সময় প্রয়োজনীয় জলের অভাব না হয়। কর্কের ফাঁকগুলি ভেসলিন দিয়ে বায়ু নিরুদ্ধ কর (ছবি দেখ)। এইবার সমস্ত যন্ত্রটিকে সূর্যের আলোয় রাখ। তিন-চার ঘণ্টা পর পাতাটি খুলে এনে গরম অ্যালকোহলের মধ্যে রেখে পাতাটি ক্লোরোফিল শূন্য অর্থাৎ বর্ণহীন কর (পদ্ধতিটি পূর্বের একটি সংখ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে), তারপর পাতার ওপর 2% আয়োডিন দ্রবণ প্রয়োগ কর। লক্ষ্য কর, আয়োডিন দেবার ফলে পাতার যে অংশটি বোতলের বাইরে ছিল তা বেগুনী রং ধারণ করেছে, কিন্তু পাতার যে অংশটি বোতলের মধ্যে ছিল তার রঙের কোন পরিবর্তন হয়নি।

এই পরীক্ষার ফলাফল থেকে কি সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে? জেনে রাখ স্টার্চ বা শ্বেতসার পদার্থ আয়োডিনের সংস্পর্শে এলে গভীর বেগুণী রং ধারণ করে। বোতলের বাইরের পাতার অংশটি বেগুণী রং ধারণ করেছে অর্থাৎ সেখানে স্টার্চ তৈরী হয়েছে সালোকসংশ্লেষের ফলে। কিন্তু বোতলের ভেতরের পাতার অংশটি বেগুনী রং ধারণ করেনি, তাহলে সেখানে স্টার্চ তৈরী হয় নি, বোতলের মধ্যে কি ছিল? কষ্টিক পটাসের দ্রবণ ছিল, এই কষ্টিক পটাস দ্রবণ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে সুতরাং বোতলের মধ্যে কোন কার্বন ডাই অক্সাইড না থাকাতে কোন সালোকসংশ্লের হয় নি। অর্থাৎ পরিবেশের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস না থাকলে সালোকসংশ্লেষ হবে না. স্টার্চ তৈরীও হবে না। আরো সহজ করে বলা যায় উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের জন্য পরিবেশের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড থাকা অপরিহার্য।

সূর্যের আলোতে সবুজ পাতার মধ্যে স্টার্চ বা শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ তৈরী হয় পরীক্ষা করে দেখ ফলটা সঠিক কি না?

এই পরীক্ষাটি অনেকটা আগের পরীক্ষার মত। একটি টবের চারাগাছকে একটি অন্ধকার ঘরের মধ্যে দু দিন রেখে দাও। অন্ধকারে স্টার্চ বা শ্বেতসার তৈরী বন্ধ থাকবে এবং পাতার সঞ্চিত স্টার্চ উদ্ভিদের কাজে নিঃশেষিত হয়ে যাবে। দু দিন পরে অর্থাৎ তৃতীয় দিন সকাল বেলায় ঐ গাছের একটি স্টার্চ শূন্য পাতার দুই পিঠে দুইটি কালো কাগজের সরু ফালি ক্লিপ দিয়ে সাবধানে আটকে দাও (ছবি দেখ) যাতে ঐ অংশে সূর্যের আলো না লাগে। এবার গাছটিকে সূর্যালোকে অন্ততঃ পাঁচ ঘণ্টা রেখে দাও। তারপর কালো কাগজের ফালি দুটি অপসারিত করে পাতাটি গাছ থেকে ছিঁড়ে নাও এবং গরম অ্যালকোহলের মধ্যে রেখে পাতাটি ক্লোরোফিল শূন্য অর্থাৎ বর্ণহীন কর তারপর পাতার ওপর 2% আয়োডিন দ্রবণ প্রয়োগ কর। লক্ষ্য কর, কালো কাগজ দিয়ে পাতার যে অংশটি ঢাকা ছিল সে অংশটি বর্ণহীন রয়ে গিয়েছে, পাতার যে অংশে সূর্যালোক পড়েছিল তা বেগুনী রং ধারণ করেছে।

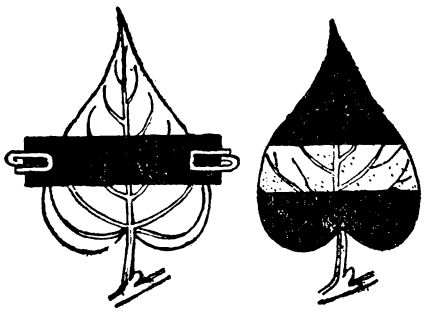

সূর্যালোকে গাছের পাতায় শ্বেতসার তৈরী।

আর একটি মজার জিনিষ চেষ্টা করে দেখতে পার এই পরীক্ষাটি করবার সময়। পাতার দুই পিঠে দুইটি সরু কালো কাগজের ফালি আটকাবার পরিবর্তে পাতার যে পিঠে সূর্যের আলো পড়ছে সেই পিঠে ফটোগ্রাফিক ফিল্মের একটি নেগেটিভ, ধর তোমারই ফটোর একটা নেগেটিভ অথবা তোমার নিজের হাতে তোলা কোন ফিল্মের একটি নেগেটিভ ক্লিপ দিয়ে আটকে দাও এবং পাতার অপর পিঠের সম্পূর্ণটাই কালো কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখ, একটু বড় সাইজের পাতা হলে ভাল হয়, শীতের মরশুমী ফুল ন্যাসটার সিয়ামের পাতা এই কাজের পক্ষে খুবই উপযোগী। এই ভাবে পাতার ওপর ফিল্মের নেগেটিভ আটকে রোদের মধ্যে গাছটিকে পাঁচ ঘণ্টা রেখে দাও। তারপর পাতার ওপর থেকে নেগেটিভ ও কাল কাগজ খুলে ফেলে পাতাটি ছিঁড়ে এনে গরম অ্যালকোহলে রেখে ক্লোরোফিল শূন্য কর এবং 2% আয়োডিন দ্রবণ প্রয়োগ কর। দেখ কোন ছবি পাতার ওপর ফুটে উঠেছে কি না। পরীক্ষাটি বেশ সাবধানে করতে হবে, প্রথম বারে সাফল্য না এলে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করতে হবে বিভিন্ন রকম পাতা নিয়ে।

"সালোকসংশ্লেষ বিক্রিয়ায় ক্লোরোফিলের প্রয়োজন হয়, ক্লোরোফিল ছাড়া সালোকসংশ্লেষ হতে পারে না।" —পরীক্ষা করে দেখ কথাটা ঠিক কিনা।

এই পরীক্ষাটির জন্য টবে জন্মান একটি কোলিয়াস গাছ (coleus) বেছে নেওয়া যেতে পারে। কোলিয়াস্ গাছের পাতার মাঝখানে কোন ক্লোরোফিল নেই, সেখানে লাল রং আছে, তার চারপাশে পাতার কিনারা অবধি ক্লোরোফিল আছে। কোলিয়াস গাছটিকে একটি অন্ধকার ঘরে দু দিন রেখে স্টার্চ শূন্য করে নাও। তৃতীয় দিন সকালে টবশুদ্ধ গাছটিকে রৌদ্রের মধ্যে রেখে তার সালোক-সংশ্লেষ ঘটাও। পাঁচ ঘণ্টা পর গাছ থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে এনে অ্যালকোহলে গরম করে ক্লোরোফিল শূন্য কর এবং 2% আয়োডিন দ্রবণ প্রয়োগ কর। লক্ষ্য কর পাতার মধ্য ভাগে যেখানে আদৌ কোন ক্লোরোফিল ছিল না সেই অংশে কোন রং ধরেনি। কেবলমাত্র পাতার কিনারা-গুলিতে যেখানে ক্লোরোফিল ছিল সেইখানেই বেগুনী বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ সালোক সংশ্লেষ ঘটেছে।

"সালোকসংশ্লেষের ফলে গাছের ওজন বাড়ে" —পরীক্ষা করে দেখ কথাটা সঠিক কিনা।

একটি গাছ যখন ধীরে ধীরে বড় হয় তখন নিশ্চয়ই তার ওজন বাড়ে, কিন্তু সালোকসংশ্লেষের ফলেই তার ওজন বাড়ছে কিনা সেটা জানা যায় কি করে? সেটা জানতে হলে সালোকসংশ্লেষ বন্ধ করে দেখা যেতে পারে গাছের ওজন বাড়ে কিনা,—যেমন গাছটিকে অন্ধকারে রেখে অথবা কার্বন ডাই অক্সাইড শূন্য পরিবেশের মধ্যে রেখে। কিন্তু আরো সহজে আর একটি পরীক্ষা করা যেতে পারে; সকালের দিকে একটি কর্ক বোরারের সাহায্যে একটি গাছের একটি তরুণ পাতা থেকে কতকগুলি 25টি গোল গোল চাকতি কেটে নাও। চাকতিগুলি কাগজে মুড়ে ওভেনে (oven) শুকতে দাও। সারাদিন ধরে সালোক-সংশ্লেষের পর বিকালের দিকে ঠিক ঐ পাতা থেকেই সমসংখ্যক (25টি) চাকতি কেটে নাও। ঐ চাকতি-গুলিও কাগজে মুড়ে ওভেনে (oven) শুকতে দাও। 48 ঘণ্টা পর ক্যামিকাল ব্যালেন্সের সাহায্যে ওজন নিয়ে দেখ বিকালের দিকের সংগৃহীত চাকতিগুলির ওজন সকালের দিকের সংগৃহীত চাকতিগুলির থেকে কিছু বেশী। সালোকসংশ্লেষের ফলেই পাতার এই ওজন বেড়েছে।

সারাদিন ধরে পাতাটি সালোকসংশ্লেষ করেছে, সকালের দিকে ঐ পাতা থেকে কেটে নেওয়া 25টি চাকতির যে ওজন ছিল বিকালের দিকে তা কিছুটা বেড়ে গেছে, সুতরাং এই বাড়তি ওজনটুকু যোগ হয়েছে সালোকসংশ্লেষের ফলেই। কর্ক বোরার তোমরা যদি যোগাড় করতে না পার তাহলে এক সেণ্টিমিটার ব্যাসের গোল গোল চাকতি কাটা যায় এমন কোন যন্ত্র তোমরা তৈরী করে নিতে পার কিংবা সকালে যে নির্দিষ্ট সাইজের পাতার অংশ নিয়েছিলে বিকালে ঠিক একই সাইজের অংশ নেবে,—এভাবেও সমস্যাটির সমাধান করা যেতে পারে। তোমাদের ল্যাব-রেটারীতে যদি ইলেকট্রিক ওভেন (oven) না থাকে তাহলে একটি জুতোর বাক্সের মধ্যে 60—100 ওয়াটের ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বালিয়ে ঐ বাক্সের মধ্যে কাগজের প্যাকেটে মুড়ে পাতার অংশগুলি রাখতে পরে সেগুলি শুকিয়ে (জলশূন্য) নেবার জন্য। বাক্সের মধ্যে তাপমাত্রা কত থার্মোমিটারের সাহায্যে হিসাব রেখ।

কিন্তু কতক্ষণ ধরে শুকাবে? সাধারণত 60-80°C এ 48 ঘণ্টা রাখলেই চলবে।

পরীক্ষাগুলি করবার সময় তার সকল খুঁটি-নাটি বিবরণ ল্যাবরেটারী নোটবুকে লিখবে, তুমি নূতন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে কিনা তাও সবিস্তারে লিখবে, ছবি আঁকবে, ফলাফলগুলি যা যা পেয়েছ তা সঠিক ভাবে লিখবে, পরীক্ষার তারিখ দেবে।

বিজ্ঞানভিত্তিক ধারাবাহিক উপন্যাস

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সবুজ বনের গান

॥ অন্ধকার সমুদ্রে ॥

জীবনে ভুলেও ঈশ্বরকে ডাকি নি। এখন মনে হল ঈশ্বরকে ডেকে দেখলে হয়। নৈলে আমার মৃত্যুটা ঠেকানোর কোনো উপায় দেখছি না। অবস্থাটাও বড় বেকায়দা যে! ব্যাটারা নাইলনের দড়িতে আমাকে এমন করে বেঁধেছে, একটুও নড়াচড়া করা যাচ্ছে না। এদিকে শয়তান ক্যারিবো বাঁকা চকচকে ছুরিটা বাগিয়ে আমার বুকে তার ধ্যাবড়া জুতোসুদ্ধু পা চাপিয়ে কুতকুতে চোখে তাকিয়ে আছে আর শাসাচ্ছে।

কিছুক্ষণ আগে কী ভদ্র আর অমায়িক চেহারা দেখেছিলুম লোকটার! এখন মনে হচ্ছে, বাস্তবিক যদি শয়তান বলে কেউ থাকে, তাহলে এই ব্যাটাই সে। এদিকে পিত্তবর্দেনে ওরফে অ্যানথুপা পিদ্রু পাশে দাঁড়িয়ে শিগগির আমার শ্বাসনলী কেটে ফেলার প্ররোচনা দিচ্ছে। প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা করছি, এখনই বুঝি ক্যারিবো আমার গলায় ছুরি চালিয়ে দেবে।

মাথা ঠিক রাখার চেষ্টা করে বললুম, "দেখুন মিঃ ক্যারিবো, আপনারা ভুল করছেন। আমি সত্যি সরকারি গুপ্তচর নই। আমার বুক পকেটে একটা কার্ড আছে। ওটা দেখলেই আমার পরিচয় পেয়ে যাবেন।"

ক্যারিবো ক্রুর হেসে বলল, "পিওবর্দেনে যখন বলেছে, তখন তার কথাই ঠিক। তুমি সরকারি ঘুঘু।"

"না মিঃ ক্যারিবো। আমি একজন সাংবাদিক মাত্র। আপনি ওর কথায় ভুল করবেন না।"

পিত্তবর্দেনে বলল, "তাহলে প্রফেসর বিকর্ণ আর ওই দাড়িওয়ালা বুড়ো কর্ণেলের সঙ্গে কিসে সম্পর্ক তোমার?"

"কোনো সম্পর্ক নেই। আমি কিওটাদ্বীপে ওঁদের অভিযানের খবর নিতে এসেছি। সেই খবর কলকাতায় আমার কাগজে পাঠাতে হবে। বিশ্বাস না হলে আমার বুকপকেটের কার্ডটা আপনারা দেখুন"

পিত্তবর্দেনে আমার বুকপকেট থেকে আইডিণ্টি কার্ডটা বের করে নেড়ে চেড়ে দেখলো তারপর ক্যারিবোকে কার্ডটা দিল সে। ক্যারিবো পড়ে দেখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এটা যে জাল নয়, তার প্রমাণ? আমি জানি, সরকারি ঘুঘুদের জাল পরিচয় পত্র থাকে।"

পিত্তবর্দেনে বলল, "আর দেরি কোরো না ক্যারিবো আমাদের রওনা দেবার সময় হয়ে এল।"

ক্যারিবো কার্ডটা আমার পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বলল, "পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে সরকারি ঘুঘু জাহান্নামে যাক। তবে পিত্তবর্দেনে, আমার মনে হয় কাজটা মাঝদরিয়ায় সেরে ফেলাই ভাল। কারণ জল পুলিশ নজর রেখেছে। রক্তমাখা মড়া সমস্যা বাধাবে।"

পিত্তবর্দেনে ভেবেচিন্তে বলল, "ঠিক বলেছ। মাঝদরিয়ায় পৌঁছে ওর শ্বাসনলী কেটে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেব। আর কেউ খুঁজে পাবে না।"

ক্যারিবো পা তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে বলল, "তারপর ওর সদগতির কোনো অসুবিধে হবে না। হাঙ্গরের ক্ষিদেয় ছটফট করে বেড়াচ্ছে।"

ওরা বেরিয়ে যাচ্ছিল। ডেকে বললুম, "মিঃ ক্যারিবো, মেরেই যখন ফেলবেন, তখন দয়া করে দড়ির ফাঁসগুলো একটু আলগা করে দিন না! বড্ড ব্যথা করছে যে!"

পিত্তবর্দেনে মুখ ভেংচে বলল, "ব্যথা করছে! করবেই তো! ঘুঘু দেখেছ বাছাধন, ফাঁদ তো দেখনি!"

"মিঃ পিত্তবর্দেনে! রোমিলার বাবার যাদুঘর থেকে যে দেবীমূর্তিটা নিয়ে এসেছেন, ওর ভেতর কিন্তু কিওটাদ্বীপের সন্ধান পাবেন না—যদিও ওটা কিওটাদ্বীপের কাঠ দিয়ে তৈরি!"

আমার এই চালে কাজ হল। ওদের দুজনের মুখেই চমক জাগল। ক্যারিবো বলল, "হুঁ, তুমি তাহলে দেখছি অনেক খবর রাখো?"

"রাখি বৈকি! আমি সাংবাদিক যে!"

পিত্তবর্দেনে আমার পাশে এসে হাঁটু মুড়ে বসে বলল,

ব্যাথা করছে, করবেই তো !

"যদি সত্যি তুমি কিওটাদ্বীপের সন্ধান জানো, তাহলে তোমার শ্বাসনলী কাটা যাবে না।"

ক্যারিবো বলল, "চালাকিতে ভুলো না পিত্তবর্দেনে! গুপ্তচররা বড় ধূর্ত।"

বললুম, "রাজাকো কিন্তু তার চেয়েও ধূর্ত ছিলেন। তাই কিওটাদ্বীপে যাবার ম্যাপখানা কাত্তির গায়ে এঁকে রেখে গেছেন।"

দুজনে আবার চমকে উঠল। এক গলায় বলল, "কাত্তি! কাত্তি!"

"হ্যাঁ, কাত্তি।"

ক্যারিবো ব্যস্তভাবে বলল, "কোথায় আছে সেই কাত্তি?"

"মিঃ কিয়াং তা হাতিয়ে নিয়েছেন রাজাকোকে খুন করে।"

এই কথাটা বলার সময় আমি আদৌ জানতুম না এরা কিয়াং নামে সেই ধনী মৎস্যব্যবসায়ী ও রাজাকোর প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুচর কি না। আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতো কিয়াংয়ের কথা বললুম। কিন্তু ঢিলটা লেগে গেল। ক্যারিবো লাফিয়ে উঠে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "কিয়াং হাতিয়েছে তাহলে? সর্বনাশ!"

পিওবর্দেনে মুখ চুণ করে বলল, "দেখলে তো ক্যারিবো? আমি তোমাকে বলেছিলুম রাজাকোকে খুন করেছে কিয়াংসায়েরর লোক। তুমি বিশ্বাস করো নি! তাছাড়া এও বলেছিলুম, রাজাকোর কাছে একটা কাত্তি আছে আমি জানি।"

বললুম, "হ্যাঁ, টুপির মধ্যে লুকোনো ছিল শুনেছি।"

ক্যারিবো কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দুমদুম শব্দে কাঠের সিঁড়ি কাঁপিয়ে একটা বেঁটে লোক এসে দরজায় উঁকি মেরে বলল, "গতিক সুবিধে নয় কর্তা! হাঙ্গরের ঝাঁক এসে পড়েছে।"

ওরা ব্যস্ত হয়ে উঠল। ক্যারিবো বলল, "পিওবর্দেনে, ওর কাছে থাকো! ৭০৩ নম্বরের নিকে রওনা দিচ্ছি।"

সবাই ওপরের ডেকে চলে গেল। পিওবর্দেনে দরজা বন্ধ করে পোর্টহোলে চোখ রেখে কিছু দেখতে লাগল। তারপর নোঙর তোলার ঘড় ঘড় শব্দ শুনতে পেলুম। তারপর স্কুনার দুলতে শুরু করল। যান্ত্রিক গর্জন কানে এল। বুঝলুম স্টার্ট দিয়েছে। আবছা জলের শব্দ, স্কুনারের প্রচণ্ড দুলুনি আর গর্জন মিলে একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেল।

কেবিনের ভেতর ততক্ষণে আলো কমে গেছে। একটু পরে আলো জ্বলে উঠল। পিওবর্দেনে পোর্টহোল থেকে হঠাৎ ছিটকে সরে এল। তারপর দুমদাম্ কট্ ফট্টাস্ এরকম অদ্ভুত সব শব্দ হতে থাকল। বললুম, "ব্যাপার কী মিঃ পিওবর্দেনে?"

সে দাঁত মুখ খিচিয়ে বলল, "চুপ ব্যাটা কলকাতাই ভূত!"

গ্রাহ্য না করে বললুম, "কার সঙ্গে লড়াই বাঁধল বুঝি?"

পিওবর্দেনে আমার কথার জবাব না দিয়ে কোনার দিকে কাঠের দেয়ালের একটা হুকে হ্যাঁচকা টান মারল। দেখি, ওটা একটা প্রকাণ্ড দরাজ। দরাজ থেকে সে যা বের করল, তা একটা স্টেনগান আর একটা কার্তুজের বেল্ট। সে পোর্টহোলের কাচটা সরিয়ে স্টেনগানের নল ঢুকিয়ে দিল। তারপর গুলি ছুঁড়তে শুরু করল।

বুঝলুম কাদের সঙ্গে জোর লড়াই বেধেছে। ছোট্ট জাহাজটা বেজায় দুলছে। মাঝে মাঝে ভীষণভাবে কাত হয়ে যাচ্ছে। আর আমি কাঠের মেঝেয় অসহায়ভাবে একবার এদিকে একবার ওদিকে গড়িয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু তাতে একটা লাভ হল। বাঁধনগুলো অনেকটা ঢিলে হয়ে গেল। একটু পরে পোর্টহোলের কাচটা ঝন-ঝন শব্দে ভেঙে গেল। পিওবর্দেনে মুখ বিকৃত করে লাফ দিয়ে সরে এল। তারপর সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল। কেবিনে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার এবার। সেই সুযোগে বাঁধন খুলতে থাকলুম। পিওবর্দেনে পোর্টহোলের কাছে আছে, তা বুঝতে পারছি। খোলা পোর্টহোল দিয়ে হু হু করে সমুদ্রের জল ঢুকে ঝাপটানি দিচ্ছে। গুলিগোলার আওয়াজ ক্রমশ কমে আসছে। কিন্তু সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছি। এদিকে কেবিনে জল ঢুকে মেঝে জলময় হয় যাচ্ছে। বাঁধন খুলে সাবধানে উঠে বসলুম যখন, তখন কেবিনের ভেতর কয়েক ইঞ্চি জল। যখনই স্কুনার কাত হচ্ছে, তখন বেশি করে জল ঢুকছে। আমার ভয় হল, এই লোনা জলে শেষ পর্যন্ত ডুবে মরব না তো?

তার আগেই একটা কিছু করা দরকার। পিওবর্দেনের চেহারা আবছা দেখা যাচ্ছিল। সে পোর্টহোলে কী একটা চাপা দেবার চেষ্টায় ব্যস্ত। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছি, সেইসময় দরজায় ধাক্কা পড়ল। জলের শব্দের মধ্যে কে চেঁচিয়ে ডেকে বলল, "পিওবর্দেনে! পিওবর্দেনে! বেরিয়ে এস! স্কুনারে জল ঢুকছে।"

পিওবর্দেনে ঝটপট দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। ভাগ্যিস আলো জ্বালল না। বিপদের মুখে তার এটাই স্বাভাবিক। খোলা দরজা দিয়ে এবার জলের প্রবল ছাঁট এসে ঢুকতে লাগল। মেঝেয় এখন প্রায় হাঁটু জল জমে উঠেছে। বুঝতে পারলুম, স্কুনার ডুবতে চলেছে। প্রতিপক্ষের গুলিগোলায় নিশ্চয় ঝাঁঝরা হয়ে গেছে স্কুনারটার শরীর।

এতক্ষণে আমার সত্যিকার মৃত্যুভয় জেগে উঠল। ক্যারিবোর ছুরির মুখে তত বেশি ভয় পাই নি, কারণ জীবনে এমন অবস্থায় অনেকবার পড়েছি। কিন্তু এবার সাক্ষাৎ যম স্বয়ং সমুদ্র।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঁকি দিলুম। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। অন্ধকার সমুদ্র ভয়ঙ্কর গর্জন করছে। স্কুনারে কোথাও আলো নেই। কোনো সাড়া শব্দ নেই। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে আছে। স্কুনারটা অসহায়ভাবে মোচার মতো প্রচণ্ড দুলছে। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে ছিটকে সমুদ্রে গিয়ে পড়ব। তার ওপর মুহুর্মুহু জলের ঝাপটানি। ভিজে নাকাল হয়ে গেছি। কাঁপুনি শুরু হয়েছে ঠাণ্ডায়।

তাহলে কি এই সমুদ্রসমাধিই বরাতে ছিল আমার? অতিকষ্টে ওপরের ডেকে হাঁটু দুমড়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে এগিয়ে গেলুম। সমুদ্রের গর্জনে কান পাতা দায়। বৃষ্টি ঝাঁকে ঝাঁকে সূচ বেঁধাচ্ছে শরীরে। ওপরের

কেবিনের কাছে যেতেই বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল। সেই আলোয় দেখলুম, একটা ছায়ামূর্তি কী একটা টানাটানি করছে।

আবার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল। লোকটাকে চিনতে পারলুম। পিওবর্দেনে!

আসন্ন মৃত্যুর মুখে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। ঝাঁপিয়ে পড়লুম তার ওপর। "তবে রে হতচ্ছাড়া বদমাস! এবার তোর কী হয়?"

পিওবর্দেনে বেকায়দায় পড়ে মাতৃভাষায় কী সব আওড়াতে থাকল। তাকে জাপটে ধরে ভিজে ডেকের ওপর ফেলে হাঁকাতে হাঁকাতে বললুম, "কী রে ব্যাটা? আমার শ্বাসনলী কাটবি বলেছিলি যে বড়? এবার দ্যাখ, কে কার শ্বাসনলী কাটে!"

পিওবর্দেনে গোঙাতে গোঙাতে বলল, "কিন্তু তুমিও কি রক্ষা পাবে ভাবছ? সমুদ্র তোমাকে গিলে খাবে। বরং তার চেয়ে আমাকে সাহায্য করো! তাহলে দুজনেই প্রাণে বাঁচব।"

ওর কথাটা শুনে আমার বুদ্ধিসুদ্ধি ফিরে এল। বললুম, "কী সাহায্য রে শয়তানের বাচ্চা?"

"কেবিনের কার্নিশে একটা রবারের নৌকো আটকানো আছে। ওটা টেনে বের করতে পারছি না।"

"তোর বন্ধুরা কোথায় গেল?"

"ওরা আমাকে ফেলে বোটে চেপে কেটে পড়েছে। ওরা আমার বন্ধু নয়, শত্রু!" বলে সে কেঁদে ফেলল। "উঃ! ক্যারিবো এমন করবে আমি ভাবতেও পারি নি!"

ওর কান্না দেখে মনটা নরম হল। সমুদ্রের গ্রাস থেকে বাঁচতে হলে এখনও ওর সহযোগিতাও দরকার। বললুম, "তোমার স্টেনগানটা কোথায়, আগে দাও। তারপর কথা হবে।"

"বিশ্বাস করো, ওরা কেড়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু আর দেরি করা উচিত নয়, যদি প্রাণে বাঁচতে হয়। স্কুনারটা আর মিনিট কুড়ি-পঁচিশের মধ্যেই ডুবে যাবে হয়তো। চলো, আমরা রবারের নৌকোটা টেনে বের করি।"

ওকে ছেড়ে সতর্কভাবে উঠে দাঁড়ালুম। এতক্ষণে মনে পড়ল আমার পকেটে রিভলবার আছে। জলে ভিজে গেলেও ওটার সাহায্যে পিওবর্দেনেকে শায়েস্তা করতে অসুবিধে হবে না।

রিভলবারটা ওর বুকে ঠেকিয়ে বললুম, "চলো! কোথায় নৌকো আছে দেখি।"

পিওবর্দেনে কাকুতি-মিনতি করে বলল, "বিশ্বাস করো! আমি ক্যারিবোর মতো দুষ্ট লোক নই। ওর প্ররোচনায় পড়ে রোমিলার সঙ্গে নেমকহারামি করেছি। জানতুম না, নচ্ছার ঠক আসলে মূর্তিটা হাতানোর জন্য আমার সঙ্গে ভাব জমাবে।"

"ঠিক আছে। চলো, নৌকো কোথায় আছে দেখি।"

স্কুনার একপাশে কাত হয়ে গেছে। বৃষ্টিটা ধরে এল। কিন্তু ঝোড়ো বাতাস থামল না। টলতে টলতে অনেক কষ্টে রবারের নৌকোটা টেনে বের করলুম দুজনে। তারপর পালাক্রমে ফুঁ দিয়ে ওটাকে ফোলাতে শুরু করলুম। ততক্ষণে স্কুনার আরও কাত হয়েছে। দুজনেরই দম ফুরিয়ে মারা পড়ার দাখিল। নৌকোটা আসলে গোল মোটরের টায়ারের মতো প্রকাণ্ড একটা চাকা এবং মধ্যিখানে আন্দাজ এক বর্গমিটার একটা রবারের বালিশ আটকানো। সেটাও দম দিয়ে ফোলানো হল। তারপর পিওবর্দেনে বলল, "তুমি আগে উঠে বসো। আমি ঠেলে ভাসিয়ে দিয়ে তারপর উঠব।"

স্কুনারের যেদিকটা কাত হয়ে সমুদ্রের ঢেউ ঢুকছে, সেদিকে ঠেলে দিল পিওবর্দেনে। তারপর নিজে এক লাফে উঠে বসল। সে যেন নাগরদোলায় চড়া। স্কুনারের রেলিঙ হাত বাড়িয়ে ধরে সে রবারের এই অদ্ভুত ভেলাটাকে শেষ প্রান্তে নিয়ে গেল। লোকটার বুদ্ধি আছে বটে! শেষ দিকটায় না নিয়ে গেলে ঢেউয়ের ঝাপটায় ভেলাসমেত আমরা আবার ডেকে গিয়ে পড়তুম।

সমুদ্র এবার আমাদের লুফে নিল। প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা হচ্ছিল তলিয়ে যাব, কিন্তু এই আশ্চর্য ভেলা দিব্যি ভেসে রইল ঢেউয়ের মাথায় একবার ওপরে একবার নিচে নাগর-দোলার মতো।

ঢেউয়ের মাথায় পৌঁছুলে দিগন্তে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য আলোর ঝাঁক দেখতে পাচ্ছিলুম। আবার হারিয়ে যাচ্ছিল কালো জলের দেয়ালের পেছনে।

চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলুম, "পিওবর্দেনে! ওটা কোন দ্বীপ?"

জলের গর্জনের ভেতর পিওবর্দেনে কী বলল, শুনতে পেলুম না। যদিও সে আমার মাত্র একহাত দূরে ফুলন্ত টায়ারের মতো ভেলার কিনারা আঁকড়ে বসে আছে।

মাথার ওপর এতক্ষণে নক্ষত্র ঝিকমিক করতে দেখা গেল। বাতাসটাও কমে এল ক্রমশ। কিছুক্ষণ আগে যে লোকটি ছিল আমার জঘন্য শত্রু, সে এখন বন্ধু হয়ে গেছে। কারণ প্রাণের দায় বড় দায়। রবারের ভেলায় দুজনেই ঠাণ্ডাহিম শরীরে ভেসে চললুম। কোথায় পৌঁছুব কে জানে!

(ক্রমশঃ)

পদার্থ বিদ্যার প্রশ্নোত্তর

তাপ ও কাজ

অলক চক্রবর্তী

এর আগে আমরা 'তাপ প্রয়োগে অবস্থার পরিবর্তন'—এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত প্রশ্নোত্তরের আলোচনা করেছি। এবার আমরা 'তাপের প্রকৃতি এবং তাপ ও কাজ'—এই বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

তোমরা প্রশ্নটা পড়েই উত্তর দেখো না, একটু ভেবো। বরং তোমার ভাবনার সঙ্গে উত্তরটার মিল খোঁজো।

এবার কাজের কথায় আসা যাক্।

প্রশ্ন 1 ঃ তাপ দিলে পদার্থের কি কি পরিবর্তন ঘটতে পারে, তার কয়েকটা উদাহরণ দাও।

উত্তর 1 ঃ তাপ দিলে পদার্থের নিম্নলিখিত পরিবর্তন ঘটতে পারে !

(i) পদার্থের ভিতরকার শক্তি বেড়ে যায়, ওটা গরম হয়।

(ii) পদার্থের আয়তন বেড়ে যায়।

(ব্যাতিক্রম ঃ 0°C থেকে 4°C পর্যন্ত জলে তাপ দিলে আয়তন কমে যায়)।

(iii) পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন (ভৌত পরিবর্তন) ঘটতে পারে—পদার্থ কঠিন থেকে তরলে ও তরল থেকে বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হতে পারে।

উদাহরণ ঃ বরফ (কঠিন)-এ তাপ দিলে একসময় ওটা গলনের ফলে জলে পরিণত হয়; আবার জলকে (তরল) যথেষ্ট তাপ দিলে ওটা জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়।

(iv) তাপ দিলে রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটতে পারে।

উদাহরণ ঃ চুনাপাথরে ($CaCO_3$) তাপ দিলে চুন (CaO) এবং কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) পাওয়া যায়।

বিক্রিয়া ঃ $CaCO_3 = CaO + CO_2$.

প্রশ্ন 2 ঃ থার্মোমিটারের নানারকম স্কেলে ঊর্ধ্ব ও নিম্নস্থিরাঙ্ক কত ?

উত্তর 2 ঃ সেন্টিগ্রেড স্কেলে ঊর্ধ্বস্থিরাঙ্ক 100°C এবং নিম্নস্থিরাঙ্ক 0°C, ফারেনহাইট স্কেলে যথাক্রমে 212° F ও 3.°F, রয়মার স্কেলে যথাক্রমে 80° R ও O°R এবং কেলভিন স্কেলে (যদিও এটার বাস্তব অস্তিত্ব নেই) যথাক্রমে 373°k ও 273°k

প্রশ্ন 3 ঃ দুটো কেটলীতে সমান ভরের দুধ ও জল নিয়ে দুটোকেই সমান হারে গরম করা হল। দেখা গেল জলের চেয়ে দুধের উষ্ণতা বাড়ার হার বেশী। এরকম হবার কারণ কি ?

উত্তর 3 ঃ জলের আপেক্ষিক তাপ দুধের চেয়ে বেশী বলেই ওর উষ্ণতা বাড়ার হার কম।

প্রশ্ন 4 ঃ থার্মোমিটারের নিম্নস্থিরাঙ্ক ও ঊর্ধ্বস্থিরাঙ্ক কাকে বলে ?

উত্তর 4 ঃ যে উষ্ণতায় স্বাভাবিক চাপে বিশুদ্ধ বরফ গলতে শুরু করে তাকে থার্মোমিটারের নিম্নস্থিরাঙ্ক বলে।

আর যে উষ্ণতায় স্বাভাবিক চাপে বিশুদ্ধ জলের স্ফুটন হয়, তাকে থার্মোমিটারের ঊর্ধ্বস্থিরাঙ্ক বলে।

প্রশ্ন 5 ঃ জ্বর দেখবার থার্মোমিটারের (ডাক্তারী-থার্মোমিটার) সাধারণ বর্ণনা দাও। মানুষের দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা কত ধরা হয় এবং ঐ থার্মোমিটারে উষ্ণতার কি স্কেল ব্যবহার করা হয় ?

উত্তর 5 ঃ কাচের তৈরী ডাক্তারের থার্মোমিটারের নীচের দিকে একটা কাচের কুণ্ডে কিছু পারদ নেওয়া হয়। দেহের সংস্পর্শে ঐ কুণ্ড গরম হলে পারদ আয়তনে বেড়ে একটা সরু নল বেয়ে ওপরদিকে উঠতে থাকে। থার্মোমিটারের নলের গায়ে উষ্ণতায় স্কেল আঁকা থাকে।

মানুষের দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা ধরা হয় 98·6°F বা 37°C.

ডাক্তারী থার্মোমিটারে আগে উষ্ণতার ফারেনহাইট স্কেল ব্যবহার করা হত (95·F থেকে 110·F বা 94°F থেকে 108°F পর্যন্ত আঁকা থাকত), কিন্তু এখন সেলসিয়াস স্কেল ব্যবহার করা হয় যার সাধারণ দাগ হয় 35°C থেকে 44°C.

প্রশ্ন 6 ঃ "তোমার আপেক্ষিক তাপ 0·09—বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর 6 ঃ 1 গ্রাম ভরের তামার উষ্ণতা 1°F বাড়াতে 0·09 ব্রিটিশ থার্মাল একক তাপের দরকার।

বা

1 পাউণ্ড ভরের তামার উষ্ণতা 1°F বাড়াতে 0·09 ব্রিটিশ থার্মাল একক তাপের দরকার।

প্রশ্ন 7 ঃ "তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক 778 ফুট পাউণ্ড। বৃ. থা. এ." বলতে কি বোঝ ?

উত্তর 7ঃ কথাটার মানে, 778 ফুট পাউণ্ড কাজ 1 বৃ. থা. এ. তাপের সমান, অর্থাৎ 1 বৃ. থা. এ. তাপ তৈরী করতে 778ফুট পাউণ্ড কাজ করতে হয়।

প্রশ্ন 8 ঃ বস্তু যে তাপ নেয় বা ছাড়ে তা কি কি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে।

উত্তর 8 ঃ বস্তু যে তাপ (H) নেয় বা ছাড়ে তা বস্তুর ভর (m), ওর আপেক্ষিক তাপ (s) এবং ওর উষ্ণতা বাড়া বা কমার (t) ওপর নির্ভর করে। ওদের সম্পর্ক হল ঃ

$H = m.s.t$

প্রশ্ন 9 : "তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক (J) 4·2 জুল / ক্যালরি"—বলতে কি বোঝ ?

উত্তর 9 : উক্তিটির দ্বারা এই বোঝায় যে 1 ক্যালরি তাপ তৈরী করতে 4·2 জুল (বা $4·2 \times 10^7$ আর্গ) কাজ করতে হয়।

প্রশ্ন 10 : এক বালতি সাধারণ উষ্ণতার জলে একটি লাল করে গরম করা ছুঁচ ফেললে তাপ কোন দিক থেকে কোন্‌দিকে যাবে ? এটা থেকে কি সিদ্ধান্তে আসা যায় ?

উত্তর 10 : তাপ ছুঁচ (উঁচু উষ্ণতা) থেকে বালতির জলের (নীচু উষ্ণতার) দিকে যাবে।

সিদ্ধান্ত : তাপের পরিমাণ যাই হোক না কেন তাপ সব সময় উঁচু উষ্ণতার পদার্থ থেকে নীচু উষ্ণতার পদার্থের দিকে যায়।

প্রশ্ন 11 : তাপ ও উষ্ণতা মাপার যন্ত্রের নাম কর।

উত্তর 11 : তাপ ক্যালরিমিটার দিয়ে ও উষ্ণতা থার্মোমিটার (বা তাপমান যন্ত্র) দিয়ে মাপা হয়।

প্রশ্ন 12 : গতি আছে এরকম কোন বস্তু হঠাৎ বাধা পেয়ে থেমে গেলে ওটার কিসের পরিবর্তন ঘটবে ?

উত্তর 12 : গতি আছে এরকম কোন বস্তু হঠাৎ বাধা পেয়ে থেমে গেলে ওর গতিশক্তি তাপশক্তি হয়ে যাবে। স্থির হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ওর গতির বিরুদ্ধে যে পরিমাণ কাজ করা হবে, তা সমান তাপে রূপান্তরিত হয়ে বস্তুর উষ্ণতা বাড়াবে।

প্রশ্ন 13 : $W = JH$-র মানে কি? এর সঙ্গে কোন বিজ্ঞানীর নামের সম্বন্ধ আছে কি ? J-র মান কত ?

উত্তর 13 : W-পরিমাণ যান্ত্রিক কাজ দ্বারা H পরিমাণ তাপ তৈরী করা গেলে (যখন তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক J) $W = J.H$ হয়।

বিজ্ঞানী জেমস প্রেসকট জুল সূত্রটার আবিষ্কর্তা বলে তার নামের আদ্যক্ষর (প্রথম অক্ষর) 'J' দিয়ে তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ককে সূচিত করা হয় এবং তাঁর নাম অনুসারেই 'J' কে জুল তুল্যাঙ্কও বলা হয়।

সি. জি, এস. পদ্ধতিতে 'J'-এর মান 4·2 জুল/ ক্যালরি এবং এফ, পি, এস্ পদ্ধতিতে 'J'-এর মান 778 ফুট পাউণ্ড/ বৃ, থা, এ,।

প্রশ্ন 14 : প্রাথমিক-অন্তর কাকে বলে ?

উত্তর 14 : থার্মোমিটারের নিম্নস্থিরাঙ্ক ও ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্কের মধ্যেকার উষ্ণতার তফাৎকে প্রাথমিক অন্তর বলে।

প্রশ্ন 15 : এক গ্রাম বিশুদ্ধ জলের উষ্ণতা 1°C বাড়াতে কি পরিমাণ তাপ লাগবে এবং কি পরিমাণ কাজ করতে হবে ? ঐ পরিমাণ কাজকে কি বলে ?

উত্তর 15 : 1 ক্যালরি তাপ লাগবে।

4.2×10^7 আর্গ বা 4.2 জুল কাজ করতে হবে।

প্রতি ক্যালরি তাপের জন্যে 4.2 জুল করা কাজকে তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক (বা জুল তুল্যাঙ্ক) বলে।

প্রশ্ন 16 : "কোন বস্তুর জলসম 10 গ্রাম"—বলতে কি বোঝ ?

উত্তর 16 : বস্তুটার উষ্ণতা 1°c বাড়াতে যে পরিমাণ তাপের দরকার ঐ তাপ দিয়ে 10 গ্রাম জলের উষ্ণতা বাড়ানো যাবে।

প্রশ্ন 17 : একটা বস্তু স্থির উষ্ণতাতে থাকলে ওর তাপের পরিমাণ জানা সম্ভব নয়। কিন্তু অনেকগুলো বস্তুর মধ্যে তাপের দেয়ানেয়ার সময় এটা পরিমাপ করা যায়। এর কারণ কি ?

উত্তর 17 : তাপের অস্তিত্বের সংজ্ঞা শক্তি পরিবহনের সময় দেয়া যায়। যেমন : 'কোন বস্তুতে কাজ' কথাটির কোন মানে হয় না—"বস্তু দ্বারা করা কাজ" বা "বস্তুর ওপর করা কাজ"—অর্থ আছে। সেই রকম তাপের চলাচল কেবল একবস্তু থেকে অন্যবস্তুতে (আলাদা উষ্ণতা বিশিষ্ট) ঘটতে পারে। স্থির উষ্ণতার কোন বস্তুতে ওর আণবিক আন্দোলনহেতু তাপশক্তি ও যান্ত্রিক শক্তি দুটোই থাকবে। কিন্তু ওদের আলাদা করা সম্ভব নয়। সুতরাং পূর্বে বলা জায়গার মতো তাপ প্রবাহ না ঘটলে তাপের পরিমাণ অসম্ভব। একমাত্র যদি একবস্তু থেকে অন্যবস্তুতে তাপের চলাচলা হয় তখনই চলাচলকারী তাপের পরিমাণ সম্ভব।

প্রশ্ন 18 : একই ভর বিশিষ্ট এবং একই উষ্ণতা-বিশিষ্ট তামা ও সীসার দুটো বলকে দুটো একই ভর-বিশিষ্ট এবং একই উষ্ণতা বিশিষ্ট জলে (জলের উষ্ণতা বলের উষ্ণতা থেকে অলোদা) ফেলা হল। দুটো ক্ষেত্রেই জলের চূড়ান্ত উষ্ণতার পরিবর্তন হবে কি ?

উত্তর 18 : তামার ও সীসার বল দুটোর ভর ও উষ্ণতা সমান হলেও তামার আপেক্ষিক তাপ সীসার চেয়ে বেশী বলে তামার বল দ্বারা নেয়া বা ছাড়া তাপের পরিমাণ বেশী হবে [$H = m.\ s.\ t$ সূত্র অনুযায়ী]। সুতরাং প্রথমে জলের উষ্ণতা বলের উষ্ণতার চেয়ে বেশী (বা কম) হলে জল দ্বারা নেয়া (বা ছাড়া) তাপ তামার ক্ষেত্রে বেশী হবে ; ফলে সেই পাত্রের জলের উষ্ণতা বাড়া (বা কমা) বেশী হবে। অর্থাৎ দুটোপাত্রের জলের চূড়ান্ত উষ্ণতা আলাদা হবে।

জয়পুরিয়া কলেজ, কলকাতা-5

অমর মিত্র

কাশী থেকে শীতের ভয়ে বড় পিসিমা কলকাতায় চলে এসে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে দিয়েছেন। বিধবা মানুষ, ছোঁয়াছুয়ির বিচার তাঁর বড় বেশী। তাতেই এ বাড়ির সবাই তটস্থ হয়ে থাকে। এখানে পিঁয়াজ ওখানে মাছ রসুন এ সব নিয়ে তাঁর খুঁতখুতানি লেগেই আছে। কিন্তু ও সবও কোন সমস্যা নয়, এবারের চিন্তা হয়েছে রিণ্টুর ল্যাবরেটরি নিয়ে। প্রথম দিন সন্ধেয় ওই ল্যাবরেটরিতে ঢুকে নাকেমুখে কাপড় চাপা দিয়ে আঁতকে বেরিয়ে এসে এই শীতের ভিতর বালতি বালতি জলে চান করেছেন তিনি। তারপরেই জ্বর।

যে শীতের ভয়ে বাবা বিশ্বনাথের চরণ থেকে পালিয়ে এলেন তিনি, তা আর রক্ষা হল না। বেজায় ঠাণ্ডা লেগে গেছে। বিছানায় শুয়ে তিনি বিড়বিড় করছেন, ওই শিশিবোতলের নিকেশ করে আমি এখান থেকে যাব।

রিণ্টুর ল্যাবরেটরির শিশিবোতল বের করে গঙ্গাজল দিয়ে ওই ঘর না ধুয়ে বড় পিসি শান্তি পাচ্ছেন না! তাঁর মন বড়ই উতলা হয়েছে একমাত্র ভাইপো রিণ্টুর জন্য। ওই শিশিবোতলের ঘর থেকে ওর যে সর্বোনাশ হয়ে যাবে!

রিণ্টু গত বছর মাধ্যমিক স্টার্ পেয়েছে। বড় হয়ে তার নামী বৈজ্ঞানিক হওয়ার ইচ্ছে। ইলেভেন-টুয়েলফ ক্লাসে সায়েন্স নিয়ে পড়ছে। তার ঘরে নিউটন আইন-স্টাইন সি. ভি. রমন থেকে হরগোবিন্দ খোরানার ছবি টাঙ্গানো আছে। প্রত্যেকদিন ঘুমোতে যাবার আগে সে মনে মনে এই স্মরণীয় বৈজ্ঞানিকদের কাছে প্রার্থনা করে, আমি যেন তোমাদের মত হতে পারি! আমার আর কিচ্ছু চাই না, শুধু বড় বৈজ্ঞানিক ক'রে দাও।

খুড়তুতো বোন ঝুমঝুমি এসে বলল, রিণ্টুদাদা ট্রানজিস্টর রেডিও নাও জেঠুর কাছ থেকে, লুকিয়ে লুকিয়ে গান শোনা যাবে!

ঝুমঝুমি গানের পোকা। গানের গলাও বেশ ভাল। কিন্তু রেডিওর অশ্রাব্য হিন্দিগান ওর শোনা বারণ। ওর জন্য এক ওস্তাদ রাখা হয়েছে! তার কাছে এখন থেকেই ও রেওয়াজ করে। বয়স কত হবে। দশ বারো বছরের কিছুতেই বেশী নয়।

সক্কলকে হতাশ ক'রে রিণ্টু ওর বাবাকে বলল, নিচের ঘরে আমায় একটা ল্যাবরেটরি তৈরি করে দাও, ক্লাসে যা পড়ব, ঘরে এসে হাতে কলমে দেখব, তাতে পড়াটাও ভাল মনে থাকবে।

ভোম্বল বাবুয়া ঝুমঝুমি একসঙ্গে বলল, তুমি একদম বোকা!

রিণ্টুর বাবা কিন্তু খুব খুসী হয়েছিলেন ছেলের কথা শুনে। ছেলে মাধ্যমিকে স্টার পাওয়ায় তাঁর বুক তো দশ হাত হয়েই ছিল। রিণ্টুর কথা শুনে আরো পাঁচ হাত বেড়ে গেল।

নিচের তলার দক্ষিণ দিকের ঘরে গড়ে উঠল রিণ্টুর ল্যাবরেটরি। নানান অ্যাসিডের শিশিবোতল, বিকার, বিভিন্ন ধরণের ফ্লাস্ক টেস্টটিউব বকযন্ত্র ফানেল গ্যাসজার কত কী! ছোটখাট রসায়নাগার তৈরি ক'রে ফেলেছে রিণ্টু। এ ছাড়াও অবসর সময়ে তৈরি করেছে একটা সুন্দর পিন হোল ক্যামেরা। অন্ধকার ঘরে দূরে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি রাখলে ক্যামেরার ঘষা কাঁচের পর্দায় উল্টো ছায়া পড়ে। তৈরি করেছে একটা পেরিস্কোপ। সামনে আড়াল থাকলেও আড়ালের ওপারের জিনিস পেরিস্কোপ দিয়ে খুব স্পষ্ট দেখা যায়। এ সব দেখে ভোম্বল বাবুয়া ঝুমঝুমির চোখে তাক লেগে গেছে। রিণ্টু বলেছে ক'দিন বাদে লেন্স ফিট করে ছোটখাট একটা দূরবীণ তৈরি করবে। তারপর! গ্যালিলিওর সেই টেলিস্কোপ, যা দিয়ে তারা দেখা যাবে স্পষ্টভাবে।

রিণ্টুর অবসর কাটে তার ল্যাবরেটরিতে। যেখানে নানান রকম রাসায়নিক গ্যাস তৈরি ক'রে পরীক্ষা নিরীক্ষা হল ওর নেশা। কেমিস্ট্রি হল ওর প্রিয় সাবজেক্ট। অ্যাসিডে লবনে মিশে কত কী হয়ে যায়। এ সবে যেন বিস্ময়ের শেষ নেই। আর মজাটা আরো বেশী হয় যখন বিশ্লেষণ করে পরিবর্তনের কারণগুলো ও বুঝতে পারে। রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো ওর কাছে সহজবোধ্য হয়ে আসে। আর কেমিস্ট্রি দিয়েও তো বাবুয়া ঝুমঝুমিকে অবাক ক'রে দেয়া যায়! সেদিন যেমন অ্যাসিডের ভিতর নীল লিটমাস পেপার ডুবিয়ে লাল ক'রে দিল। আবার ওই লাল লিটমাস পেপারটাকে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এ ডুবিয়ে নীল করে দিল। রিণ্টু জানে অ্যাসিডে নীল লিটমাস পেপার লাল হয়, এবং ক্ষারে লাল লিটমাস পেপার নীল হয়। সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড একটা ক্ষার।

কিন্তু বড় পিসিমা তো ক্ষেপে আগুন হয়ে আছেন। রিণ্টুর ওই সাধের ল্যাবরেটরি ভাঙবেন বলে বিছানায় শুয়ে শাসাচ্ছেন। জ্বরটা একটু কমুক, ওষুধ পথ্যি ছেড়ে ভাত খাওয়া হোক, তারপর বড় পিসিমা দেখবেন কী করে ওই দুধের বাছা কোলের ছেলে রিণ্টু তার শিশি-বোতলের ঘরে ঢোকে।

রিণ্টুর বাবা তাঁর অসুস্থা দিদিকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, ওসব কিছুনা দিদি, ওর ইচ্ছে বড় সায়েণ্টিস্ট হবে, সি. ভি. রমন, হরগোবিন্দ খোরানা—!

বড় পিসি বিছানায় পা ছড়িয়ে বলেন, অতসব বুঝিনে বাপু, পণ্ডিত যদি করতে চাও সংস্কৃত পড়াও—!

কিন্তু ওর যে সায়েণ্টিস্ট হবার ইচ্ছে, আর ওতো সংস্কৃত ভাল জানে, মাধ্যমিকে লেটার ছিল··· ।

বড়পিসি তাঁর ভাইয়ের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, তোর কি আক্কেল আছে, ওই ডিমপচা গন্ধের ভিতর সর্বক্ষণ থাকলে হাড়মজ্জা অপবিত্র হয়ে যাবেনা— হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ।

রিণ্টুর বাবা দিদির উপর কথা বলতে ভয়ই পান। তারপর এটা তো ঠিক কাশীর ঠাণ্ডা কলকাতায় এসে ভর-সন্ধ্যেয় স্নান ক'রে লেগে গেছে দিদির। আর স্নান করার কারণও তো রিণ্টুর ওই ল্যাবরেটরি।

কাশী থেকে সন্ধ্যেয় বাড়ি এসেছিলেন বড় পিসি। রিক্সা থেকে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ জপতে জপতে নেমেই হাঁক ডাক। সক্কলে ছুটে এল নিচে।

দোতালায় বসে বড় পিসি রিণ্টুর মাকে বললেন, চলে এলামরে আরতি, বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছে কাশীতে, তারপর ভাবলাম কতদিন দেখিনি রিণ্টু সোনাকে, ছেলে নাকি পণ্ডিত করছিস, ভাল ভাল—।

বাক্স পেটরা সব তখন উপরে উঠে এসেছে। বড় পিসি কথা বলতে বলতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে রিন্টু, কই, কোথায় ?

বড়পিসি কাশীর পেড়া সন্দেশ এনেছেন এক হাড়ি। কিন্তু যার জন্য আনা সেই রিন্টুবাবু কোথায় গেল ?

রিন্টুর মা বললেন, ও ওর ল্যাবরেটরিতে আছে।

বড়পিসির চোখ মুখ কুঁচকে গেল. কী বললি ?

রিন্টুর মা হেসে বললেন, একতলার দক্ষিণের ঘরে, ওটা ওর ল্যাবরেটরি—

বড়পিসি একগাল হাসলেন, তাই বল, নিচের ঘরে, যাই আমি ডেকে আনি, দেখে খুব চমকে যাবে নিশ্চয়ই।

রিন্টু তার ল্যাবরেটরিতে নিবিষ্ট হয়েছিল গ্যাস প্রস্তুতিতে। দরজা ভেজানো। বাইরের শব্দ খুব একটা ভিতরে ঢোকেনা। বড় পিসিমার আসার খবর ও জানেনা। মমতাময়ী বড়পিসি হাতে বড় একটা পেড়া সন্দেশ নিয়ে চুপি চুপি ভেজানো দরজা ঠেলে ল্যাবেরেটরিতে ঢুকে পড়েছেন।

রিন্টুসোনা—ডেকে উঠতে গিয়ে বড়পিসির দুচোখ গোলাকার হয়ে গেল। থর থর করে তিনি কাঁপতে লাগলেন। রিন্টু বড় পিসিকে দেখে আনন্দে গ্যাসজার হাতেই দৌড়ে এল।

—ও পিসি, পিসি।

রিন্টুর হাতের গ্যাস জারের মুখ খোলা ছিল। আনন্দে ওর হাতের গ্যাসজারটা একটু হেলে গেল। বাতাসের চেয়ে ভারি গ্যাস বাইরে বেরিয়ে এল টুপ ক'রে। চারপাশের গন্ধ

কিসের গন্ধ রে ? পিসিমা ভাবতে পারছিলেন না।

গভীর হলো !

—এই ঘরে কি ডিম পচিয়ে রেখেছিস রিণ্টু ও মা মা মা, কী সর্বোনাশ, হায় হায় কী কাণ্ড, কী পচা গন্ধরে বাবা, কী বদগন্ধ !

পিসির হাত থেকে বড় সাইজের পেড়াটা মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তিনি লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে বারন্দায় দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন, হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ !

রিণ্টু পিসির কাণ্ড দেখে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। গ্যাসজারটা ল্যাবরেটরিতেই রেখে এসেছে। পিসি ওকে দেখে যেন আঁতকে উঠলেন আবার।

– ছুঁবিনে ছুঁবিনে, ঘর ময় পচা ডিম, জামাকাপড় সব নোংরা হয়ে গেল, ছিহ্ ছিহ্ !

রিণ্টুর মাথায় এতক্ষণে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। সে তার ল্যাবরেটরিতে ফেরাস সালফাইডের ভিতর সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস তৈরী করছিল। বাতাসের চেয়ে ভারি ওই গ্যাস গ্যাসজারে জমা করছিল বায়ু। অপসারণ ক'রে। গ্যাসটার গন্ধ একটু উগ্র, আর ঠিক পচা ডিমের মত। অবিকল ডিমপচা গন্ধ। পিসি সেই ভুল করেছে।

সে পিসিকে বোঝাতে চায়, ও পিসি না, না, ও হ'লো গিয়ে সালফিউরেটেড হইড্রোজেন বা হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস, এইচ টু এস, আমি তৈরি করছিলাম, ডিমের গন্ধ নয়, ওই গ্যাসের গন্ধ।

কিন্তু রিণ্টুর কথা কে শোনে। পিসি তর তর ক'রে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যান, কী সর্বোনাশ, কাপড় চোপড়ে ডিম লাগল কিনা কেজানে, ঘরময় তো পচা ডিম···।

বলতে বলতে রিণ্টুর বড় পিসিমা স্নানের ঘরে ঢুকেছেন। বালতি জলে তিনি নিজেকে শুদ্ধ করে নিতে লাগলেন। কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে তিনি ঠাকুর ঘরে ঢুকলেন ভিজে কাপড়ে। আর তার পরেই তাঁর হাঁড় কাঁপিয়ে জ্বর এল। তিনি বিছানায় পড়লেন।

বড় পিসির জ্বর তখন ছাড়ার মুখে। কিন্তু তিনি ভিতরে ভিতরে বড় কষ্টে আছেন। সেই কষ্ট প্রকাশ করতেও পারছেন না। ওই রিণ্টুসোনার টানেই তো তার কলকাতায় আসা। তিনি নিঃসন্তান বিধবা, রিণ্টুকে বুকে ক'রে বড় করেছেন। গত বছর পাঁচ না হয় কাশী বাসী হয়েছেন। অথচ সেই রিণ্টুকে তাঁর ছুঁতে ভয় হচ্ছে। ছুঁলে যদি চান করতে হয়। ওই নিচের অপবিত্র অশুদ্ধ ঘরে তো রিণ্টু সর্বক্ষণ কাটায়।

আর রিণ্টু। তার দুঃখের কথা শুধু সেই জানে। বড় পিসির কাছে গিয়ে যে একবার বসবে তার উপায় নেই। এমন কী জ্বরের ঘোরে যখন বড় পিসি বার বার তার নাম ধরে ডাকছিলেন, তখনো যে পিসির কপালে হাত রাখতে পারেনি। কী জানি যদি পিসির আবার বাই চাপে, স্নান করবেন !

প্রথম দিন ভাত খেয়েই বড় পিসি বললেন, 'পচা-ডিমের লেখাপড়া করাতে হবে না ছেলেটাকে।'

রিণ্টুর বাবা পড়েছেন বিপদে। কী করে বোঝানো যায় তাঁর দিদিকে তা মাথায় ঢোকেনা। রিণ্টু কাঁদ কাঁদ চোখ মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইতি মধ্যে খবরটা ওর মাসতুতো ভাই ভোম্বলের কানে গেছে। সে থাকে কাছেই। খবর শুনে হাসতে হাসতে এ বাড়িতে এসে পিসিমাকে প্রমাণ করল।

—বেঁচে থাক বাবা, তুমি ওসব কর না তো !

—না, না, আমি তো আগেই ওকে বলেছিলাম গাভাসকারের সই করা ভাল ডিউজ ব্যাট নিতে, উনি তা না নিয়ে ওই শিশি বোতল কিনেছেন !

ভোম্বল আর ঝুমঝুমি রিণ্টুর দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। এরই ভিতর এসে জুটল ওর স্কুলের বন্ধু বাবুয়া। সে আর এক কাঠি—। পিসিকে তো তাতে লাগল বসে বসে। আর মাঝে মধ্যেই ঢিপ ঢিপ প্রণাম।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক হওয়া যার স্বপ্ন, তার কাছে এসব তো কিছুই না। পরের দিন রবিবার। রিণ্টু সকাল বেলা বই পত্তর নিয়ে ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ঢুকেছে। ঝুমঝুমি বসেছে গানের রেওয়াজ করতে। আর পিসি স্নান যাওয়ার আগে আবার ভাবলেন যাই দেখে আসি তো কী করছে ছেলেটা ! মুখ শুকনো ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আহা !

তিনি আবার চুপিচুপি ঢুকেছেন ওই ঘরে। হাতে স্নানের বালতি, গামছা, মাথায় তেল দেয়া হয়ে গেছে। রিণ্টু হাতে কলমে তৈরি করছিল আর একটা গ্যাস। সে পিসিকে দেখে চমকে গেছে। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসেছে। নাকে কেমন ঝাঁজ লাগছে না ! না, ডিম পচা গন্ধ নয়। কিন্তু এ যে অন্য গন্ধ ! ঝাঁজালো, চোখ মুখ জ্বালা করছে পিসির।

—কী অনাসৃষ্টি, ঘরে বাথ রুমের গন্ধ কেন, পেচ্ছাপের গন্ধ—!

পিসির চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। তিনি মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বেরিয়ে এলেন বাইরে। না, আর হবে না। সত্যিই, উচ্ছন্নে গেছে ছেলেটা। কোন ভদ্র

বাড়ির ঘরে এ সব হয়! রিণ্টু পিসির পিছনে পিছনে প্রায় দৌড়চ্ছে, ও পিসি যেয়ো না!

—না যাব না, ঘর ময় কী গন্ধ, ছিহ্ ছিহ্ ছিহ্!

রিণ্টু বোঝাতে যায় পিসিকে। পিসি ততক্ষণে স্নান ঘরে দরজা দিয়েছেন। রিণ্টু তখনো বলছে, ও হ'লো অ্যামোনিয়া গ্যাস, নিশাদল মানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড আর পোড়াচুন মানে ক্যালসিয়াম অক্সাইড, আমি ল্যাবরেটরিতে তৈরি করছিলাম, আজই প্রথম তৈরি করেছি ওই দুটোতে বিক্রিয়া ঘটিয়ে।

—আমাকে আর বোঝাসনে, আমি কিছু বুঝিনে ভেবেছিস, ওটা কিসের গন্ধ আমি জানিনে, হরে কৃষ্ণ।

রিণ্টুর সব আশা গেছে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ওর পিসি ঘোষণা করেছেন, হয় ওই শিশি বোতলের অনাছিষ্টি থাকবে, না হয় তিনি, কালকেই তিনি কাশী চলে যাবেন।

অতএব! ল্যাবরেটরি তো তুলে দিতে হয়। রিণ্টু তার ঘরের দেয়ালে টাঙানো স্মরণীয় বিজ্ঞানীদের দিকে ছলছল চোখে তাকায়। এই শীতে কাশী চলে গেলে বড় পিসি আর বাঁচবেন না। বরং সেই ছেড়ে দেবে বৈজ্ঞানিক হওয়ার বাসনা। আগে তো বড় পিসি বাঁচুন।

সোমবার পড়াশুনোয় একদম মন বসে না রিণ্টুর। ইস্কুলে বার বার অন্য মনস্ক হয়ে যায়। কেমিস্ট্রির প্রাকৃটিক্যাল ক্লাসে ঢোকে না। ব্যাপারটা নজরে এল কোমস্ট্রির টিচার নীরদ বাবুর। এরকম তো হয় না কোন দিন!

তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করলেন। তারপর বললেন, আজ বিকেলে আমি যাব তোমাদের বাড়ি, দেখি কী করা যায়।

রিণ্টু হতাশ, কিছুই হবে না স্যার, বড় পিসি বুঝবেন না, কাল কাশী চলে যাবেন বলে বাক্স প্যাটরা বাঁধছেন।

—দেখ না কী হয়!

চারটের সময় নীরদবাবু রিণ্টুদের বাড়ি এসে সোজা তার ল্যাবরেটরিতে ঢুকে গেলেন। রিণ্টু নিচে ডেকে আনল ওদের বাড়ির কাজের লোক গদাইকে। তাকে মাষ্টার মশাই কি সব বুঝিয়ে দিলেন। গদাই ঘাড় নাড়তে লাগল, হ্যাঁ হ্যাঁ সব ঠিক আছে!

তখন সন্ধ্যে নামছে। গদাই চিৎকার করতে করতে দোতলায় উঠে এল।

—ও বাবা গো, কী হল গো, রিণ্টু দাদাবাবু মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। আতঙ্কিত হয়ে ছুটে এলেন বড় পিসি। রিণ্টুর মা তো ভোম্বলদের বাড়ি গেছে।

—নিচের শিশিবোতলের ঘরে দাদাবাবু পড়ে গেছে। গদাই হাঁপাতে থাকে।

বড় পিসি থমকে গেছেন। সেই অশুদ্ধ ঘরে! কী হবে! ওর মাও যে বাড়ি নেই। তাঁর স্নেহময়ী মন উতলা হয়ে গেল। তিনি আলুথালু বেশে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলেন। স্নান যদি করতে হয় আবার, করবেন। কিন্তু কই! ওই তো ছেলে হাসছে। আর এই ঘর কী সেই ঘর নয়! কী আশ্চর্য সুবাস সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে আছে। তিনি শ্বাস টানতে লাগলেন।

ও রিণ্টু, তুই মাথা ঘুরে—

রিণ্টু কথা বলছে না। হাসছে ঠোঁট চেপে।

—কিসের গন্ধ রে! পিসি ভাবতে পারছিলেন না সেই বদ ঝাঁজালো গন্ধ কিভাবে উধাও হল এ ঘর থেকে। কেমন পাকা ফলের গন্ধ, পাকা কলার গন্ধ ঘরময় ভাসছে।

—তুই পড়িসনি মাথা ঘুরে?

—ওকথা না বললে তুমি আসতে।

—এ কিসের গন্ধ, খুব সুন্দর তো!

রিণ্টুর স্যার ওকে এস্টার তৈরি করা শিখিয়ে দিয়ে চলে গেছেন। সেই এস্টারের গন্ধ উড়ছিল ঘরে।

—ও পিসি, এর নাম এস্টার, আমি তৈরি করেছি।

বলতে বলতে রিণ্টু বিকারটা সাবধানে ধরে এগিয়ে এল। রাখল সামনের টেবিলে। পিসি মুখ বাড়ালেন। নাক টানতে লাগলেন। তাঁর মনেই নেই যে এই ঘরের হাইড্রোজেন সালফাইড আর অ্যামোনিয়ার গন্ধে তিনি এ বাড়ি ছেড়ে কাশী ফিরে যাবেন ভেবেছেন।

—পলিয়েস্টারের জামা আছে না, তা আসলে হলো এই এস্টারের অনেকগুলো অনু··। রিণ্টু পিসিকে বোঝাতে চায়।

পিসি অনেকক্ষণ পরে মুখ তোলেন, 'বাহ্, এরকম যদি তৈরি করিস তো কিছু বলার নেই, বৈজ্ঞানিক হবি বাবা রিণ্টু, তা হ, কিন্তু মানুষের, আমাদের মত মুখ্যু মানুষের কল্যানে লাগে এমন কিছু তৈরি করিস, এই যেমন এস্টার, এইরকম সুগন্ধ তৈরি করিস মানুষের জন্য, ভালো জিনিস তৈরি করিস, খারাপ জিনিস নয়।

দরজার মুখে রিণ্টুর মা, ঝুমঝুমি। এ দৃশ্য দেখে রিণ্টুর মায়ের মন ভরে গেল, তিনি এগিয়ে এসে বললেন, হ্যাঁ উনি যা বলছেন, তাই ঠিক!

27/বি, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলি-37

এমন উপহার ওদের দিন যা ওদের সাথেই স্বপ্ন দেখে বড় হয়

চিলড্রেনস গিফট প্ল্যান ইউনিটস

আপনার ছেলেমেয়েদের ইউনিট কিনে দিন। ৫০ টাকা থেকে শুরু করে ১০ এর গুনিতকে যে কোন সংখ্যার আপনার খুশীমতন। তাদের ইউনিটের সাথে সাথেই তারা বড় হয়ে উঠবে, তাদের স্বপ্ন সত্যি হবে।

ছেলে বা মেয়ের বয়স ২১ হয়ে গেলেই বা মেয়েদের বয়স ১৮ ছুলেই হাতে আসবে এক থোক টাকা। আর ঠিক সেই সময়েই ছেলেমেয়ের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন পড়ে মূলধনের।

আরো একটা বিস্ময় উপহার: নির্দিষ্ট কিছু দিন পর পর সৌভাগ্য লটারী তাদের সামনে এনে দেয় বামপার ক্যাশ পুরস্কার লাভের সুযোগ।

এটা একটা বাড়তি বোনাস। স্বপ্ন সত্যি হয় ইউনিটে

ইউনিট ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া
(একটি সরকারী ক্ষেত্রের আর্থিক সংস্থা)
প্রধান কার্যালয় : বোম্বাই ৪০০ ০২০
আঞ্চলিক কার্যালয় : ৪ ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০০১
ফোন : ২৩-৯৩৯১, ২৩-১৬৩৮, ২৩-৮৮১৮, ২২-৮৭৯৫

সঞ্চয় গড়ে তুলুন ইউনিটে ইউনিটে

Sista's-UTI-080A83/BEN

অভিজাত মৌল ঃ প্ল্যাটিনাম

অমরনাথ রায়

আজ থেকে বহুকাল আগেকার কথা। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে থিব্‌স (Thebes)-এ একটি মিশরীয় বাক্স আবিষ্কৃত হয়েছিল। বাক্সটির উপরে ছিল চিত্রলিপি। ফরাসী রসায়নবিদ বার্থেলো বাক্সের উপরকার চিত্রলিপি পরীক্ষা করে দেখে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন যে ঐ চিত্রলিপি প্ল্যাটিনাম, ইরিডিয়াম ও সোনার সংকর ধাতু দিয়ে রচিত হয়েছিল। 1557 খ্রীষ্টাব্দে 'স্কেলিজার' নামে জনৈক বিজ্ঞানী বলেছিলেন যে মেক্সিকোর খনিতে এমন একটি ধাতুর সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন যাকে স্পেনিয়রা আগুনে গলিয়ে কিংবা অন্য কোন উপায়ে তরলে পরিণত করতে পারেনি। 1735 খ্রীষ্টাব্দে ডন অ্যান্টানিও ডি উল্লোয়া নামে এক ব্যক্তি মেক্সিকো পরিদর্শনে গিয়ে স্কেলিজার বর্ণিত ধাতুটির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। মেক্সিকোর আদিম অধিবাসীরা ঐ ধাতুটির নাম দিয়েছিল 'প্ল্যাটিনা ডি পিণ্টো'। চার্লস উড্ নামে এক ব্যক্তি 1741 খ্রীষ্টাব্দে কলম্বিয়া থেকে ইউরোপে সর্বপ্রথম ঐ ধাতুটিকে নিয়ে আসেন। এর ন' বছর বাদে 1750 খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম ব্রাউনরিগ নামে জনৈক রসায়নবিদ ধাতুটির ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী পরীক্ষা করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে লুইস, মারগ্রাফ, বার্গমান প্রমুখ রসায়নবিদেরাও ঐ ধাতুটি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। কাউন্ট ডন সিকিনজেন নামে প্যারিসের এক রাষ্ট্রদূত 1772 খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ঐ ধাতুটির পাতলা পাত ও সরু তার প্রস্তুত করেন। সেই পাত ও তার 1806 খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে বিক্রি হয়। দর পাওয়া যায় আউন্স প্রতি ষোল শিলিং।

ধাতুটির নাম প্ল্যাটিনাম। স্পেনীয় শব্দ Plate মানে রূপা। Plate থেকে প্ল্যাটিনাম শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। প্ল্যাটিনাম যে একটি মৌল তা 1774 খ্রীষ্টাব্দের আগে সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় নি। রসায়ন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মৌলের মত এই মৌলটিরও যাবতীয় ধর্ম মানুষের জানা হয়ে গেল। রসায়নবিদেরা প্ল্যাটিনাম মৌলটিকে Pt. চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করলেন। মৌলটির পরমাণু ক্রমাংক স্থির হলো 78, পরীক্ষা ও গণনা ক'রে জানা গেল যে এর পারমাণবিক গুরুত্ব 195·09· আরও পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে এর ঘনত্ব 21·46 গ্রাম/সি. সি., গলনাংক 1772°C এবং স্ফুটনাংক 3800°C।

মৌল হিসাবে প্ল্যাটিনাম অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে বা সংকর ধাতু হিসাবে প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। ভূত্বকে এই মৌলটির পরিমাণ যৎসামান্য। মাত্র $5\times10^{-7}\%$. কানাডার নিকেল খনিতে অল্প পরিমাণে প্ল্যাটিনাম পাওয়া যায়। প্ল্যাটিনামের আকরিক পাওয়া যায় অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস-এ, ক্যালিফোর্ণিয়া, কলম্বিয়া, বোর্ণিও এবং উরাল পর্বতমালায়। নিকেল আকরিকের সঙ্গে প্ল্যাটিনাম থাকলে তাকে 'মণ্ড নিকেল' পদ্ধতিতে পৃথক করা হয়।

প্ল্যাটিনামকে অ্যামোনিয়াম ক্লোরোপ্ল্যাটিনেট যৌগে পরিণত করে উত্তপ্ত করলে স্পঞ্জের মতো প্ল্যাটিনাম পাওয়া যায়। স্পঞ্জ প্ল্যাটিনামকে লোহিত তপ্ত করে হাতুড়ির ঘা মেরে শক্ত পাতে পরিণত করা যায়। ধাতুটির গলনাংক খুব বেশি বলে একে বৈদ্যুতিক চুল্লী অথবা অক্সি-হাইড্রোজেন শিখার সাহায্য ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে গলানো যায় না।

কিন্তু একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, 450°C এর বেশি উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে প্ল্যাটিনামের ওজন কমে যায়।

ধাতুটি কোনও একক অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয় না। দ্রবীভূত হয় অম্লরাজ বা অ্যাকোয়া রিজিয়ায়। অম্লরাজ হলো তিন আয়তন গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং এক আয়তন গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণ। প্ল্যাটিনাম সাদা রঙের ধাতুও বেশ প্রসারণশীল। উচ্চ তাপেও ধাতুটি বেশ উজ্জ্বল থাকে। অধিক উষ্ণতায় উত্তপ্ত প্ল্যাটিনামের সঙ্গে হ্যালোজেন মৌলগুলির ও ক্ষারের বিক্রিয়া ঘটে। স্পঞ্জের মতন প্ল্যাটিনাম, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও কার্বন মনক্সাইড গ্যাসকে শোষণ করতে পারে।

প্ল্যাটিনাম একটি বিরল এবং অনেকাংশে নিষ্ক্রিয় ধাতু। বিরলতা ও নিষ্ক্রিয়তার দরুণ এই ধাতুটি অলংকার তৈরীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। প্ল্যাটিনামের ফ্রেমে হীরা বসিয়ে জড়োয়া অলংকার তৈরি করা হয়। প্ল্যাটিনামের সঙ্গে পরিমিত নিকেল ও দস্তা মিশিয়ে তৈরি করা হয়

এক সংকর ধাতু, যার নাম 'সাদা সোনা' বা white gold। আবার এর চেয়েও মূল্যবান সংকর ধাতু হলো 'প্ল্যাটিনাম গোল্ড'। এতে তিনভাগ সোনা এবং পাঁচ ভাগ প্ল্যাটিনাম থাকে। অলংকার নির্মাণে সাধারণতঃ সাদা সোনা বা white gold-ই ব্যবহৃত হয়।

অধিক তাপসহ পাত্র (crucible), চুল্লী, থার্মোকাপ্‌ল, রেজিস্টেন্স থার্মোমিটার ইত্যাদি প্রস্তুতিতে প্ল্যাটিনাম ব্যবহার করা হয়। প্ল্যাটিনামকে টুকরো টুকরো ক'রে গুঁড়িয়ে ফেললে এর রাসায়নিক কার্যকারিতা আরও বেড়ে যায়। বেশির ভাগ ধাতুর মতো একেও মিহি গুঁড়োয় পরিণত করা যায়। সেই মিহি গুঁড়োর রং কিন্তু সাদা নয়—কালো। ঐ কালো গুঁড়োকে বলা হয় 'প্ল্যাটিনাম ব্ল্যাক'। অ্যাজবেস্টসের উপর ঐ গুঁড়ো সঞ্চিত ক'রে প্ল্যাটিনামযুক্ত অ্যাজবেস্টস তৈরি করা হয়। এ জিনিসটি তারা অনুঘটকরূপে অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগকে ত্বরান্বিত করে। প্ল্যাটিনাম ও রোডিয়ামের সংকর ধাতু ব্যবহার করা হয় অ্যামোনিয়া গ্যাসকে জারিত ক'রে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতিতে এবং মিথেন থেকে হাইড্রো-সায়ানিক অ্যাসিড প্রস্তুতিতে। আবার প্ল্যাটিনাম ও ইরিডিয়ামের সংকর ধাতু শক্ত ও ক্ষয়রোধক পদার্থ বলে এ দিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ, শল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ও সঠিক দৈর্ঘ্যের স্কেল বা মাপনী প্রস্তুত করা হয়। অনেক জৈব যৌগ সংশ্লেষণে অনুঘটক রূপে প্ল্যাটিনামের মিহি গুঁড়ো ব্যবহার করা হয়।

অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে প্ল্যাটিনামের স্বাতন্ত্র্য খুবই স্পষ্ট বোঝা যায়। এই স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে কিছুটা আভিজাত্য আছে বলে অনেকে মনে করেন। তাই প্ল্যাটিনামকে অনেকে 'অভিজাত মৌল' নামে অভিহিত ক'রে থাকেন। প্ল্যাটিনাম মহার্ঘ ধাতু। সোনার চেয়েও দামী—অনেক দামী। প্ল্যাটিনামের গহনাও তাই সোনার গহনার চেয়ে অনেক বেশি অভিজাত।

ইন্দা, খড়্গপুর, মেদিনীপুর

যা আমি দেখেছি

শিবের জটা

মানস কুণ্ডু

ভূটানে গিয়ে যখন পৌঁছলাম আমাদের ট্যুরের সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তবু এতদূর এসে কিছু না দেখেই কি ফিরে যাওয়া যায়? বিশেষতঃ জীবনে আর আসা হবে কিনা কে জানে! তাই ভূটানে 'ঝটিকা সফর' করতে হল। ঘরে ফেরার আগের দিন চড়লাম মহাকাল পর্বতে। চড়া আর কোথায়, একটু উঠেই তো বসে পড়ি, অবশ্য আবার উঠি, হাঁটি; কিন্তু আবার বসিও—বিশ্রাম নিতে হয় ঘন ঘন।

ঘণ্টা দেড়েক উল্টোপাল্টা ঘুরেছি, তারপর হাজির হলাম একটা গুহায়। জীবনে গুহা খুব বেশী দেখিনি; তায় আবার এ এক বিশেষ ধরনের গুহা। উৎসাহটা স্বাভাবিক ভাবেই অনেক বেশী। আরও দু একজন ট্যুরিস্টকে দেখলাম টর্চ নিয়ে ঢুকছে; সঙ্গ নিলাম আমরাও। গুহার ভেতরটা একটু স্যাঁতস্যাঁতে মনে হল। দেখে অবাক হয়ে গেলাম গুহার ভেতর কতগুলো বটগাছের ঝুরির মত কি যেন নামছে, আর তার গা বেয়ে জল পড়ছে, যেন বলছে, 'চুপ্ চুপ্'। এক ভদ্রলোক বললেন, 'খোকা দিয়াশলাই ধরাও তো'। ইচ্ছে ছিল বলি যে আমি খোকা নই। তবু প্রতিবাদ না করেই ভদ্রলোকের থেকেই দিয়াশলাই নিয়ে কাঠি জ্বালালাম, কিন্তু নিভে গেল। ভদ্রলোক ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। গুহার ওপর দিকে নাকি এক গুপ্ত প্রস্রবন আছে, আর গুহার ওপর আছে প্রচুর চুনাপাথর। এই জল আর চুনাপাথর বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করে ক্যালসিয়াম অক্সাইড, জল আর কার্বন ডাই অক্সাইড ($CaCo_3 + H_2O = Co_2 + H_2O + CaO$)। ক্যালসিয়াম অক্সাইড বহুদিন ধরে জমতে জমতে বটের ঝুরির মত দেখতে হয়ে গেছে। আর কার্বন ডাই-অক্সাইডও জ্বলতে দিচ্ছে না দিয়াশলাই এর কাঠিকে। আমি বললাম, 'বেশ মজার জিনিস তো'। উনি বললেন, 'আরো মজার ব্যাপার এখানকার লোকেদের ধারণা। ওদের ধারণা ক্যালসিয়াম অক্সাইডের স্তম্ভগুলো নাকি শিবের মাথার জটা। আর এই শিবের জটা থেকে জল পড়ছে সব সময়। গুহার ভেতরকার দেবতাই নাকি আলো অপছন্দ করেন বলে আলো নিবিয়ে দেন!'

অবশ্য টর্চের আলো নিভে যাচ্ছিল না, কারণ টর্চের আলো জ্বালতে তো আর অক্সিজেন লাগছে না।

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ হস্টেল, পোঃ রহড়া, 24-পরগনা।

একটি পত্র

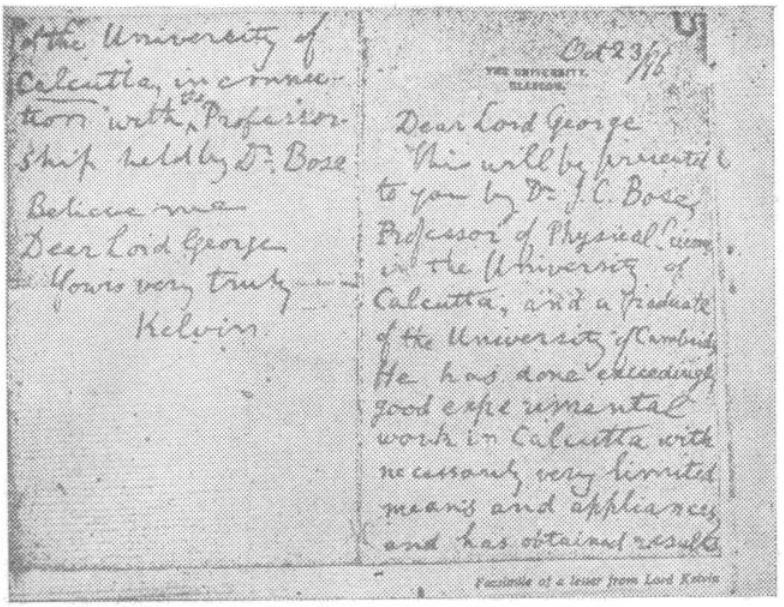

আচার্য জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সম্পর্কে লর্ড কেলভিনের একটি পত্র।

Oct 23/96
THE UNIVERSITY, GLASGOW.
Dear Lord George
This will be presented to you by Dr J.C. Bose, Professor of Physical Science in the University of Calcutta, and a graduate of the University of Cambridge. He has done exceedingly good experimental work in Calcutta with necessarily very limited means and appliances and has obtained results
of the University of Calcutta, in connection with the Professorship held by Dr Bose.
Believe me
Dear Lord George
Yours very truly
Kelvin

Facsimile of a letter from Lord Kelvin

প্রভূত উন্নতি মোটামুটি শর্ট আর মিডিয়াম ওয়েভ ব্যাণ্ডকে ঘিরেই। Lee de Forest আবিষ্কার করলেন ভ্যাল্‌ভ্‌ (valve)। রেডিও আরও সহজ হল। কিন্তু একটি কথা ;—বর্তমানে আমরা যখন জানি যে পরে মাইক্রো-ওয়েভেরও প্রভূত উন্নতি হয়েছে আর তাকে সংকেত পাঠাবার কাজে ভালভাবেই লাগান গেছে, তখন 5 মিলি-মিটার মাইক্রোওয়েভকে যিনি প্রথম সংকেত পাঠাবার কাজে লাগান, সেই জগদীশচন্দ্রকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে। তাই বলি প্রথম দিকে বলা প্রথম প্রশ্নটির উত্তর যে সাধারণ অর্থে বলা হয় তা ঠিক নয় বটে, কিন্তু ঠিক উত্তরও বিজ্ঞানী হিসেবে জগদীশচন্দ্রকে অনেক ওপরে বসায়।

হাইজ্‌, লজ, রিঘি বা মার্কোনির প্রথম কাজের মতই জগদীশের বিদ্যুৎ ঢেউ সৃষ্টি করবার প্রধান উপায় ছিল বৈদ্যুতিক স্ফুলিংগ বা Spark সৃষ্টি। কিন্তু ঐ রশ্মির উপস্থিতি বুঝতে জগদীশচন্দ্র যে অদ্ভূত নতুন যন্ত্রটি তৈরী করলেন তা হল আবার পৃথিবীর প্রথম 'অর্ধপরিবাহী' (Semiconductor) গ্রাহক যন্ত্র! অলিভার লজ ব্যবহার করতেন 'কোহেরার' নামের যন্ত্র। তা ছিল লোহাচুরের গুঁড়ো ভর্তি প্যাকেট, যার সঙ্গে সারিতে থাকত ব্যাটারি ও গ্যালভানোমিটার। বিদ্যুৎঢেউ এসে পড়লেই কোহেরারের রোধ কমে যেত, গ্যালভানোমিটারে বইত বিদ্যুৎ স্রোত। জগদীশচন্দ্র কিন্তু প্রথম বিজ্ঞানী যিনি কোহেরারের এরকম ধর্ম কেন তা বোঝবার জন্য ধারাবাহিক গবেষণা চালিয়ে যান। সেজন্যে তিনিই প্রথম আবিষ্কার করলেন যে ধাতুর ওপরে ছুঁচের ডগার মত ধাতুর একটি শলা ছুঁয়ে থাকলেও সেটি মাইক্রোওয়েভের গ্রাহক যন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। Solid State physics এ যাকে point Contact Rectification বলা হয় তার বিষয় তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। 1901 সালে রয়্যাল ইনটিটিউসনে তিনি আর একটি যন্ত্র দেখালেন। এর নাম দিয়েছিলেন তিনি 'কৃত্রিম চক্ষু' (Artificial Retina)। জিনিসটি হল সীসের একটি স্ফটিক, গ্যালিনা (galena)। গ্যালিনার টুকরোর ওপরে ছোট্ট পিন ছুঁয়ে আছে! এই যন্ত্রটার যে বিশ্লেষত্ব তিনি দেখালেন তা হল এই যে বিদ্যুৎরশ্মি ছাড়াও আলট্রাভায়োলেট, ইনফ্রারেড সাধারণ আলো, সবকিছুই যদি এই সংযোগ-বিন্দুতে এসে পড়ে তবে একটা বিদ্যুৎ-সাড়া পাওয়া যায়। তিনি যন্ত্রটির আর একটা নামও রেখেছিলেন, তা হল "তেজো মিটার" (সংস্কৃত "তেজস্‌" + ইংরাজি "মিটার")। জগদীশের পক্ষে এটির পেটেণ্ট নিয়েছিলেন ইংলণ্ডে নিবেদিতা ও আমেরিকায় সারা বুল। কিন্তু জগদীশ-পেটেণ্ট বিক্রী করে টাকা করতে চান নি।

প্রথম কৃস্টাল-রেডিও ডিটেক্টর তৈরির সম্মান দেওয়া হয় জেনারেল Dunwoody কে। তিনি সিলিকন কারবাইড ব্যবহার করেছিলেন। তিনি পেটেণ্টর দরখাস্ত দেন 1906 সালে। কিন্তু 1901 সালেই গ্যালিনা ব্যবহার করে জগদীশ একই ধরণের কাজ করেছেন—পেটেণ্ট পেয়েছেনও 1904 সালে। কেন জানিনা, বিজ্ঞান জগতে একথা সকলেই ভুলে গিয়েছিল।

প্রবন্ধের কলেবর বড় হয়ে যাচ্ছে, তাই এখানেই থামছি। পরে লেখার সুযোগ এলে জড় ও জীবনের সাড়া সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের অদ্ভূত সব কাজের কথা বলা যাবে।

বসু ইনস্‌টিটিউট, কলি-9

আচার্য জগদীশচন্দ্রের হাতে তোলা ছবি

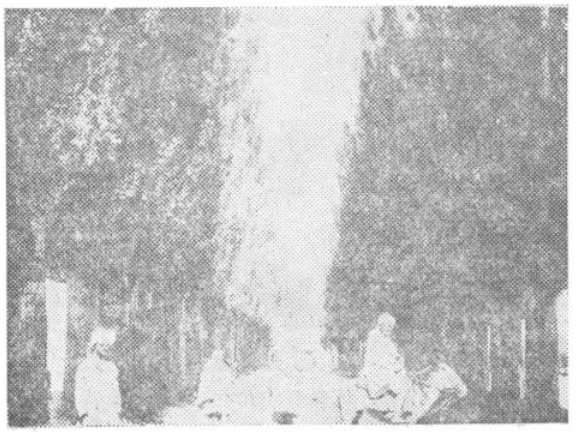

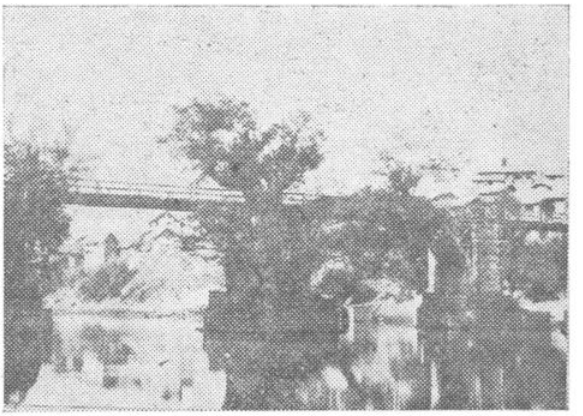

ভারতীয় সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল জগদীশচন্দ্র গবেষণা শুরুর আগে বিচিত্র হবিচর্চ্চার মাধ্যমে অবসর সময় কাটাতেন। দীর্ঘ অবকাশে তিনি দেশের নানা স্থানে ঘুরে বেরিয়েছেন। সাথে থাকতো ১০"×১২" প্লেট ক্যামেরা। ফটো তোলার পর পত্নী অবলাদেবীর সহায়তায় তিনি ফটো ডেভেলাপ্ করা, এনলার্জ করা প্রিণ্ট করা ইত্যাদি কাজ প্রায় সাথে সাথেই করে ফেলতেন। পাশে এবং উপরে জগদীশচন্দ্রের তোলা কয়েকটি ছবির নমুনা দেওয়া হল।

জগদীশচন্দ্রের ডায়েরী থেকে

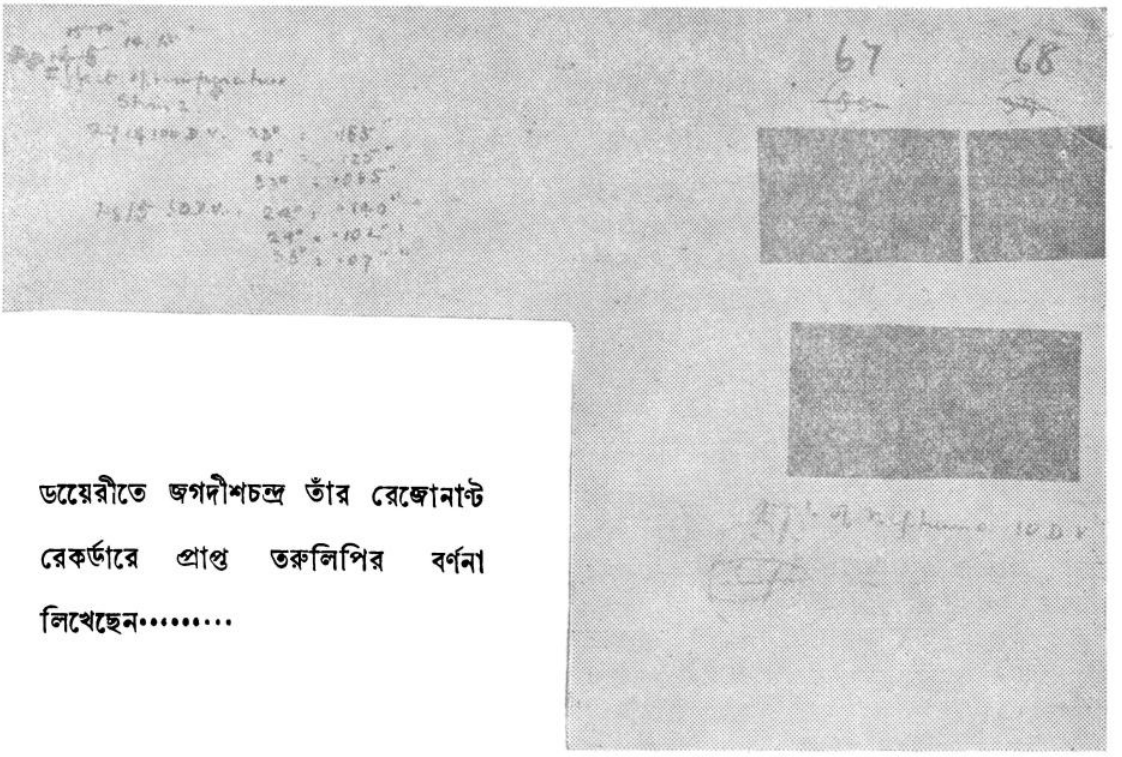

ডয়েরীতে জগদীশচন্দ্র তাঁর রেজোনাণ্ট রেকর্ডারে প্রাপ্ত তরুলিপির বর্ণনা লিখেছেন.....

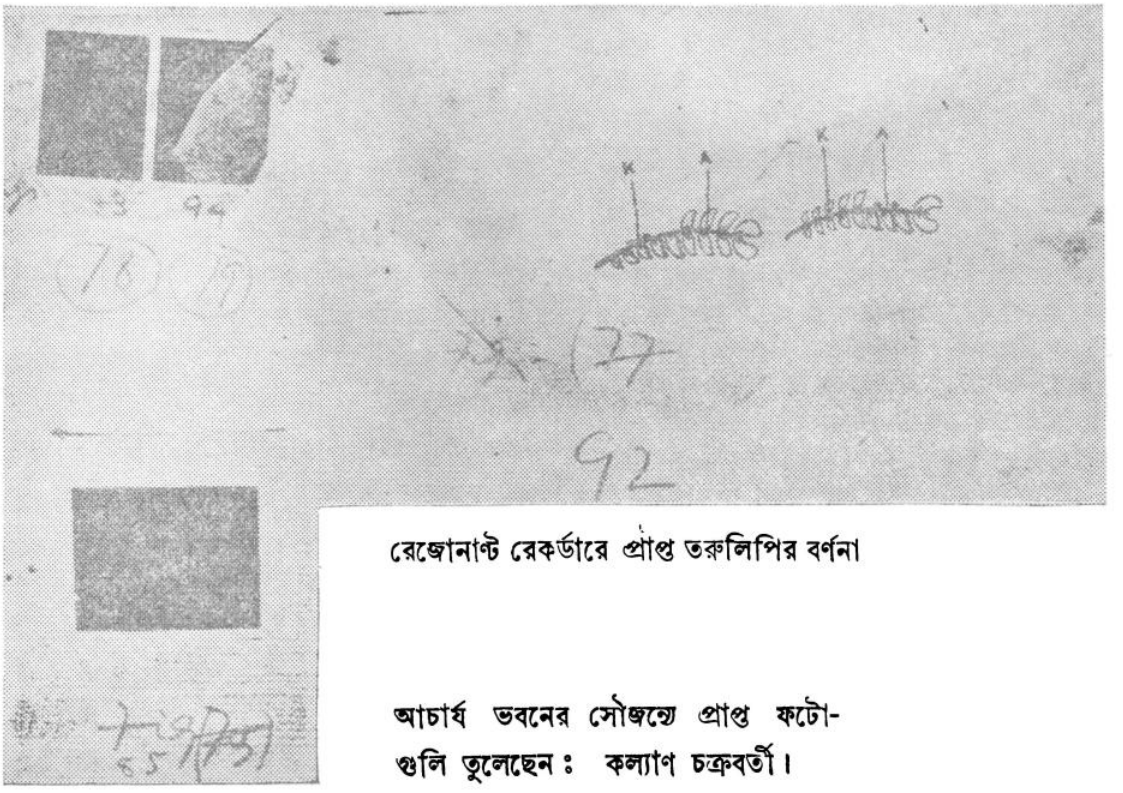

রেজোনাণ্ট রেকর্ডারে প্রাপ্ত তরুলিপির বর্ণনা

আচার্য ভবনের সৌজন্যে প্রাপ্ত ফটো-গুলি তুলেছেন : কল্যাণ চক্রবর্তী।

বিজ্ঞান সংবাদ

এ্যাডভেঞ্চার ও রোমাঞ্চকর প্রকৃতি পাঠ

"10—14 বছর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য রোমাঞ্চকর প্রকৃতি পাঠ শিবির বসবে 23—30 ডিসেম্বর 13 উত্তর-বঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চলে ব্যাগর‍্যাক্যোটের ক্যাছে লিশ নদীর বুকে। যোগাযোগ ঃ ইউথ হোস্টেলস এসোশিয়েশন, দক্ষিণ কলকাতা শাখা।

99 সাদার্ন এভেন্যু কলি-29

পরিবেশ এবং কমপিউটার বিষয়ে বক্তৃতা

বিগত 11ই অক্টোবর, 83 দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এবং রিজিন্যাল কমপিউটার সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে বহরমপুর এ কৃষ্ণনাথ কলেজে দুটি উচ্চমানের জনপ্রিয় বক্তৃতার ও আলোচনা সভা হয়।

দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশান অফ বেঙ্গলের পরিবেশ চেতনা উদ্যোগ কর্মসূচীর অন্তর্গত এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সংস্থা সম্পাদক শুভব্রত রায়চৌধুরী, তিনি পরিবেশ দুষনের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করেন, তিনি তরুনদের এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে তাদের কর্মযজ্ঞের বিভিন্ন দিকগুলি কি ভাবে ঠিক করা হবে সে বিষয়ে একটি সুন্দর পদ্ধতির উল্লেখ করেন। দীর্ঘ দেড় ঘণ্টা ব্যাপী এই আলোচনায় প্রায় আশি জন ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক কৌতূহল প্রকাশ করেন।

'কমপিউটার কি ও কেন ?' এ বিষয়ে শুভব্রত রায়চৌধুরী, রিজিওন্যাল কমপিউটার সেন্টার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে আরও একটি চিত্তা-কর্ষক বক্তৃতা দেন। তিনি কমপিউটার এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা ছাড়াও 'সংখ্যা' মূলক কোডগুলো কি ভাবে কাজ করে ও বর্ণমালাকে কিভাবে কমপিউটার সংখ্যায় রূপান্তরিত করে তার ব্যাখ্যা করেন। তরুনরা অনুশীলন হিসেবে সহজেই নিজেদের নামের বর্ণমালাকে কমপিউটার-এর সংখ্যা বিশ্লেষণ কোরে রূপান্তরিত করবার কায়দাকানুনটি আয়ত্ত্ব করে ফেলে।

এই জনপ্রিয় বক্তৃতার আয়োজন করেন মুর্শিদাবাদ জেলা বিজ্ঞান পরিষদ।

সৃষ্টি ও কৃষ্টির বার্ষিক বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক উৎসব '৮৩

আগামী ২৮শে ডিসেম্বর '৮৩ থেকে ১লা জানুয়ারী '৮৪ সৃষ্টি ও কৃষ্টির বার্ষিক বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক উৎসব '৮৩ অনুষ্ঠিত হবে। প্রদর্শনীতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং মডেল, স্পেসিমেন, তথ্য ইত্যাদির মাধ্যমে প্রদর্শন করা হবে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষবাস এবং ফসল সংরক্ষণের বিষয়টি চাষীভাইদের মধ্যে গুরুত্ব সহকারে পরিবেশন করা হবে। এছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। 'সারা বাংলা একাংক নাটক প্রতিযোগিতা' এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'একাংক নাটক' প্রতিযোগিতা এবং বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে যোগদানেচ্ছু মানুষদের এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের জন্য সৃষ্টি ও কৃষ্টির তরফ থেকে আবেদন জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক মেলা

বিগত আগামী 22শে, 23শে এবং 24শে অক্টোবর, 1983 বাঁশবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে তিনদিন ব্যাপী এক আকর্ষক ও শিক্ষামূলক বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক মেলার আয়োজন করছিলেন হুগলী জেলার সানডে সিটিং ক্লাব।

জনমানসে প্রয়োগ ও জনকল্যাণমুখী মানবতাবাদী বিজ্ঞান মনস্কতার উন্মেষ ও বিকাশ সাধন এবং সুস্থ ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সাংস্কৃতিক চেতনার জাগৃতি ও বিকাশ ছিল মেলার উদ্দেশ্য।

পলাতক তুফান

বৈজ্ঞানিক রহস্য

জগদীশচন্দ্র বসু

কয়েক বৎসর পূর্বে এক অত্যাশ্চর্য ভৌতিক কাণ্ড ঘটিয়াছিল। তাহা লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে এবং এ বিষয়ে ইউরোপ এবং আমেরিকার বিবিধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় অনেক লেখালেখি চলিয়াছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কিছু মীমাংসা হয় নাই।

28শে সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতার ইংরাজী সংবাদপত্রে সিমলা হইতে এক তারের সংবাদ প্রকাশ হয়—

সিমলা, হাওয়া আপিস 27শে সেপ্টেম্বর। "বঙ্গোপসাগরে শীঘ্রই ঝড় হইবার সম্ভাবনা।"

29শে তারিখের কাগজে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইল—হাওয়া আপিস আলিপুর। "দুই দিনের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। ডায়মণ্ডহারবারে এই মর্মে নিশান উত্থিত করা হইয়াছে।"

30শে তারিখে যে খবর প্রকাশিত হইল তাহা অতি ভীতিজনক—

"আধঘণ্টার মধ্যে চাপমান যন্ত্র দুই ইঞ্চি নামিয়া গিয়াছে। আগামীকল্য 10 ঘটিকার মধ্যে কলিকাতায় অতি প্রচণ্ড ঝড় হইবে; এরূপ তুফান বহু বৎসরের মধ্যে হয় নাই।"

কলিকাতার অধিবাসীরা সেই রাত্রি কেহই নিদ্রা যায় নাই। আগামীকল্য কি হইবে তাহার জন্য সকলে ভীত চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

1লা অক্টোবর আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইল। দুই-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

সমস্ত দিন মেঘাবৃত ছিল, কিন্তু বৈকাল 4 ঘটিকার সময় হঠাৎ আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। ঝড়ের চিহ্নমাত্রও রহিল না।

তার পর দিন হাওয়া আপিস খবরের কাগজে লিখিয়া পাঠাইলেন—

"কলিকাতায় ঝড় হইবার কথা ছিল, বোধ হয় উপসাগরের কূলে প্রতিহত হইয়া ঝড় অন্য অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।"

ঝড় কোন্ দিকে গিয়াছে তাহার অনুসন্ধানের জন্য দিক্‌দিগন্তরে লোক প্রেরিত হইল; কিন্তু তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

তার পর সর্বপ্রধান ইংরাজী কাগজ লিখিলেন—এতদিনে বুঝা গেল যে, বিজ্ঞান সর্বৈব মিথ্যা।

অন্য কাগজে লেখা হইল, যদি তাহাই হয় তবে গরিব ট্যাক্সদাতাদিগকে পীড়ন করিয়া হাওয়া আপিসের ন্যায় অকর্মণ্য আপিস রাখিয়া লাভ কি?

তখন বিবিধ সংবাদপত্র তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন—উঠাইয়া দাও।

গবর্নমেণ্ট বিভ্রাটে পড়িলেন। অল্প দিন পূর্বে হাওয়া আপিসের জন্য লক্ষাধিক টাকার ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার আনানো হইয়াছে। সেগুলি এখন ভাঙা শিশি বোতলের মূল্যেও বিক্রয় হইবে না। আর হাওয়া আপিসের বড়ো সাহেবকে অন্য কি কার্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে?

গবর্নমেণ্ট নিরুপায় হইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে লিখিয়া পাঠাইলেন—"আমরা ইচ্ছা করি ভেষজবিদ্যার এক নূতন অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন। তিনি বায়ুর চাপের সহিত মানুষের স্বাস্থ্যসম্বন্ধ-বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন।

মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ লিখিয়া পাঠালেন—"উত্তম কথা, বায়ুর চাপ কমিলে ধমনী স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি হয়। তাহাতে সচরাচর আমাদের যে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইতে পারে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। তবে কলিকাতাবাসীরা আপাততঃ বহুবিধ চাপের নীচে আছে:

১ম	বায়ু	প্রতি বর্গইঞ্চি	১৫ পাউণ্ড
২য়	ম্যালেরিয়া	,,	২০ ,,
৩য়	পেটেণ্ট ঔষধ		৩০
৪র্থ	ইউনিভার্সিটি		৫০
৫ম	ইন্‌কম ট্যাক্স		৮০
৬ষ্ঠ	মিউনিসিপাল ট্যাক্স		১ টন

বায়ুর ২।১ ইঞ্চি চাপের ইতর বৃদ্ধি 'বোঝার উপর শাকের আঁটি স্বরূপ হইবে। সুতরাং কলিকাতায় এই নূতন অধ্যাপনা আরম্ভ করিলে বিশেষ যে উপকার হইবে এরূপ বোধ হয় না।

তবে সিমলা পাহাড়ে বায়ুর চাপ ও অন্যান্য চাপ অপেক্ষাকৃত কম। সেখানে উক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।"

ইহার পর গবর্নমেণ্ট নিরুত্তর হইলেন। হাওয়া আপিস এবারকার মতো অব্যাহতি পাইল।

কিন্তু যে সমস্যা লইয়া এত গোল হইল তাহা পূরণ হইল না।

একবার কোনো বৈজ্ঞানিক বিলাতের 'নেচার' কাগজে লিখিয়াছিলেন বটে; তাঁহার থিয়োরি এই যে, কোনো অদৃশ্য ধূমকেতুর আকর্ষণে আবর্তমান বায়ুরাশি ঊর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছে।

এসব অনুমান মাত্র। এখনও এ বিষয়ে লইয়া বৈজ্ঞানিক জগতে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। অক্সফোর্ডে যে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েসনের অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে এক অতি বিখ্যাত জার্মান অধ্যাপক 'পলাতক তুফান' সম্বন্ধে অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সমবেত বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। প্রবন্ধারম্ভে অধ্যাপক বলিলেন, তুফান বায়ুমণ্ডলের আবর্তমাত্র। সর্বাগ্রে দেখা যাউক, কিরূপে বায়ুমণ্ডলের উৎপত্তি হইয়াছে। পৃথিবী যখন ফুটন্ত ধাতুপিণ্ডরূপে সূর্য হইতে ছুটিয়া আসিল তখন বায়ুর উৎপত্তি হয় নাই। কি করিয়া অম্লজান, দ্বাম্লজান ও উদ্‌জানের উৎপত্তি হইল তাহা সৃষ্টির এক গভীর প্রহেলিকা! যবক্ষারজানের উৎপত্তি আরও বিস্ময়কর। ধরিয়া লওয়া যাউক, কোনো প্রকারে বায়ুরাশি উৎপন্ন হইয়াছে। গুরুতর সমস্যা এই যে, কি কারণে বায়ু শূন্যে মিলাইয়া যায় না। ইহার মূল কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে পদার্থের উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বেশি কিংবা কম। যাহা গুরু তাহার উপরেই টান বেশি এবং তাহা সেই পরিমাণে আবদ্ধ। হালকা জিনিসের উপর টান কম, তাহা অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত। এই কারণে তৈল ও জল মিশ্রিত করিলে লঘু তৈল উপরে ভাসিয়া উঠে। উদ্‌জান হালকা গ্যাস বলিয়া অনেক পরিমাণে উন্মুক্ত এবং উপরে উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের টান একেবারে এড়াইতে পারে না। আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক সত্য বর্ণিত হইল তাহা যে পৃথিবীর সর্বস্থানে প্রযোজ্য এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে; কারণ ইণ্ডিয়া নামক দেশে যদিও পুরুষজাতি গুরু তথাপি তাহারা উন্মুক্ত, আর লঘু স্ত্রীজাতিই সে দেশে আবদ্ধ!

সে যাহা হউক, পদার্থমাত্রেই মাধ্যাকর্ষণবলে ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ থাকে। পদার্থের মৃত্যুর পর স্বতন্ত্র কথা। মানুষ মরিয়া যখন ভূত হয় তখন তাহার উপর পৃথিবীর আর কোনো কর্তৃত্ব থাকে না। কেহ কেহ বলেন, মরিয়াও নিষ্কৃতি নাই কারণ ভূতদিগকেও থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটির আজ্ঞানুসারে চলাফেরা করিতে হয়। পদার্থও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকে—পদার্থ সম্বন্ধে কথা প্রয়োগ করা ভুল; কারণ রেডিয়ামের গুতা খাইয়া পদার্থ ত্রিত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আল্‌ফা, বিটা ও গামা এই তিন ভূতে পরিণত হয়। এইরূপে পদার্থের অস্তিত্ব যখন লোপ হয় তখন অপদার্থ শূন্যে মিলিয়া যায়। কিন্তু যতদিন পার্থিব পদার্থ জীবিত থাকে ততদিন পৃথিবী ছাড়িয়া পলায়ন করিতে পারে না।

যদিও অধ্যাপক মহাশয়, পদার্থ কেন পলায়ন করে না, এ সম্বন্ধে অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগ করিলেন, তথাপি তুফান কেন পলায়ন করিল, এ সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না।

এই ঘটনার প্রকৃতি তত্ত্ব পৃথিবীর মধ্যে একজন মাত্র জানে—সে আমি।

পরের অধ্যায়ে ইহা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গত বৎসর আমার বিষম জ্বর হইয়াছিল। প্রায় মাসেক কাল শয্যাগত ছিলাম।

ডাক্তার বলিলেন—সমুদ্রযাত্রা করিতে হইবে, নতুবা পুনরায় জ্বর হইলে বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। আমি জাহাজে লঙ্কাদ্বীপ যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলাম।

এতদিন জ্বরের পর আমার মস্তকের ঘন কুন্তলরাশি একান্ত বিরল হইয়াছিল। একদিন আমার অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, দ্বীপ কাহাকে বলে?" আমার কন্যা ভূগোল-তত্ত্ব পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমার উত্তর পাইবার পূর্বেই বলিয়া উঠিল "এই দ্বীপ"—ইহা বলিয়া প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় আমার বিরল-কেশ মসৃণ মস্তকে দুই এক গোছা কেশের মণ্ডলী দেখাইয়া দিল।

তারপর বলিল, "তোমার ব্যাগে এক শিশি 'কুন্তল-কেশরী' দিয়াছি: জাহাজে প্রত্যহ ব্যবহার করিও, নতুবা নোনা জল লাগিয়া এই দুই একটি দ্বীপের চিহ্নও থাকিবে না।" 'কুন্তল-কেশরী'র আবিষ্কার এক রোমাঞ্চকর ঘটনা। সার্কাস দেখাইবার জন্য বিলাত হইতে এ দেশে এক ইংরেজ আসিয়াছিল। সেই সার্কাসে কৃষ্ণ কেশর-ভূষিত সিংহই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য দৃশ্য ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে জাহাজে আসিবার সময় আণুবীক্ষণিক কীটের দংশনে সমস্ত কেশরগুলি খসিয়া যায় এবং এ দেশে পৌঁছিবার পর সিংহ এবং লোমহীন কুকুরের বিশেষ পার্থক্য রহিল না। নিরুপায় হইয়া সার্কাসের অধ্যক্ষ এক সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হইল এবং পদধূলি লইয়া জোড়হস্তে বর প্রার্থনা করিল।

একে ম্লেচ্ছ, তাহাতে সাহেব! ভক্তের বিনয় ব্যবহারে সন্ন্যাসী একেবারে মুগ্ধ হইলেন এবং বরস্বরূপ স্বপ্নলব্ধ অব-ধৌতিক তৈল দান করিলেন। পরে উক্ত তৈল 'কুন্তল-কেশরী' নামে জগৎ-বিখ্যাত হইয়াছে। তৈল প্রলেপে এক সপ্তাহের মধ্যেই সিংহের লুপ্ত কেশর গজাইয়া উঠিল। কেশহীন মানব এবং তস্য ভার্যার পক্ষে উক্ত তৈলের শক্তি অমোঘ। লোক-হিতার্থেই এই শুভ সংবাদ দেশের সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এমন-কি, অতি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার সর্বপ্রথম পৃষ্ঠায় এই অদ্ভুত আবিষ্কার বিঘোষিত হইয়া থাকে।

২৮শে তারিখে আমি চুসান জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করিলাম। প্রথম দুই দিন ভালোরূপেই গেল। 1লা তারিখ প্রত্যূষে সমুদ্র এক অস্বাভাবিক মূর্তি ধারণা করিল, বাতাস একেবারে বন্ধ হইল। সমুদ্রের জল পর্যন্ত সীসার রঙের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল।

কাপ্তানের বিমর্ষ মুখ দেখিয়া আমরা ভীত হইলাম। কাপ্তান বলিলেন, "যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, অতি সত্বরই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। আমরা কুল হইতে বহু দূরে—এখন ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

এই সংবাদ শুনিয়া জাহাজে যেরূপ ঘোর ভীতিসূচক কলরব হইল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। চারি দিক মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার হইল এবং দূর হইতে এক এক ঝাপটা আসিয়া জাহাজখানাকে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

তার পর মুহূর্ত মধ্যে যাহা ঘটিল তাহার সম্বন্ধে আমার কেবল এক অপরিষ্কার ধারণা আছে। কোথা হইতে যেন রুদ্ধ দৈত্যগণ একেবারে নির্মুক্ত হইয়া পৃথিবী সংহারে উদ্যত হইল।

বায়ুর গর্জনের সহিত সমুদ্র স্বীয় মহাগর্জনের সুর মিলাইয়া সংহার মূর্তি ধারণ করিল।

তার পর অনন্ত ঊর্মিরাশি, একের উপর অন্যে আসিয়া একেবারে জাহাজ আক্রমণ করিল।

এক মহা ঊর্মি জাহাজের উপর পতিত হইল এবং মাস্তুল, লাইফ-বোট ভাঙিয়া লইয়া গেল।

আমাদের অন্তিমকাল উপস্থিত। মুমূর্ষু সময়ে জীবনের স্মৃতি যেরূপ জাগিয়া উঠে, সেইরূপ আমার প্রিয়জনের কথা মনে হইল। আশ্চর্য এই, আমার কন্যা আমার বিরল কেশ লইয়া যে উপহাস করিয়াছিল, এই সময়ে তাহা পর্যন্ত স্মরণ হইল—

'বাবা, এক শিশি 'কুন্তল-কেশরী' তোমার ব্যাগে দিয়াছি।'

হঠাৎ এক কথায় আর এক কথা মনে পড়িল। বৈজ্ঞানিক কাগজে ঢেউয়ের উপর তৈলের প্রভাব সম্প্রতি পড়িয়াছিলাম। তৈল যে চঞ্চল জলরাশিকে মসৃণ করে, এ বিষয়ে অনেক ঘটনা মনে হইল।

অমনি আমার ব্যাগ হইতে তৈলের শিশি খুলিয়া অতি কষ্টে ডেকের উপর উঠিলাম। জাহাজ টলমল করিতেছিল।

উপরে উঠিয়া দেখি, সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পর্বতপ্রমাণ ফেনিল এক মহা ঊর্মি জাহাজ গ্রাস করিবার জন্য আসিতেছে।

আমি 'জীব আশা পরিহরি' সমুদ্র লক্ষ্য করিয়া 'কুন্তল-কেশরী' বাণ নিক্ষেপ করিলাম। ছিপি খুলিয়া শিশি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম; মুহূর্তমধ্যে তৈল সমুদ্রে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ইন্দ্রজালের প্রভাবের ন্যায় মুহূর্তমধ্যে সমুদ্র প্রশান্ত মূর্তি ধারণ করিল। কমনীয় তৈল স্পর্শে বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত শান্ত হইল। ক্ষণ পরেই সূর্য দেখা দিল।

এইরূপে আমরা নিশ্চিত মরণ হইতে উদ্ধার পাই এবং এই কারণেই সেই ঘোর বাত্যা কলিকাতা স্পর্শ করে নাই। কত সহস্র সহস্র প্রাণী যে এই সামান্য এক বোতল তৈলের সাহায্যে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে?

[রচনাটি নিরুদ্দেশের কাহিনী গল্পের পরিমার্জিত রূপ। 'অব্যক্ত' গ্রন্থে প্রকাশকালে জগদীশচন্দ্র এটিকে পরিমার্জিত করেন।]

বৃক্ষের জন্ম ও মৃত্যু

জগদীশচন্দ্র বসু

জীবিত ও মৃতের প্রভেদ

সজীব ও নির্জীব বস্তুতে কি প্রভেদ জান? মৃত ও জীবিত জন্তুর মধ্যে কি কি ভিন্নতা বলিতে পার? একখানা কাষ্ঠ ও একটি জীবন্ত বৃক্ষে কি পার্থক্য?

জীবন বর্দ্ধনশীল আর মরণ ক্ষয়শীল। মৃত জিনিষ কোনদিন বাড়ে না, যার মধ্যে কোনরূপ গতি কি স্পন্দন নাই তাকে আমরা মৃত বলি। যাহা জীবিত তাহা ক্রমাগত বাড়িতেছে—যাহার বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া যায় তাহার ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়। মৃত্যু ক্রমশঃ নিকটে আইসে।

পাণ্ডবদিগের বনবাস কালে একবার যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত অরণ্যে যাইতে যাইতে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তৃষ্ণায় অতি কাতর হইয়া প্রথমতঃ সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতাকে জলাশয়ে পাঠাইয়া দেন। সহদেব অন্বেষণ করিতে করিতে এক সরোবর দেখিতে পাইলেন। এক যক্ষ সেই সরোবর অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

পাণ্ডুপুত্র জল আনিতে যাইতেছেন দেখিয়া যক্ষ কহিল অগ্রে আমার কয়টি প্রশ্নের উত্তর দেও, পরে জল পান করিও। নতুবা জলস্পর্শ করিলেই প্রাণ হারাইবে। পাণ্ডুপুত্র এই কথা শুনিয়া জল পান করিতে যাইয়া যক্ষের শাপে প্রাণ হারাইলেন। এদিকে সহদেব ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব করিতেছেন দেখিয়া যুধিষ্ঠির তৎপশ্চাতে নকুল, অর্জুন ও ভীমকে একে একে পাঠাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকলেরই এক দশা ঘটিল। যক্ষের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া এবং তাহার বাক্য অবহেলা পূর্বক জলস্পর্শ করিয়া একে একে চারিটি ভাই সেই যক্ষের মায়াবলে সরোবর তীরে মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের অন্বেষণ করিতে করিতে সরোবর তীরে উপস্থিত হইলেন। তখন যক্ষ তাহাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন—

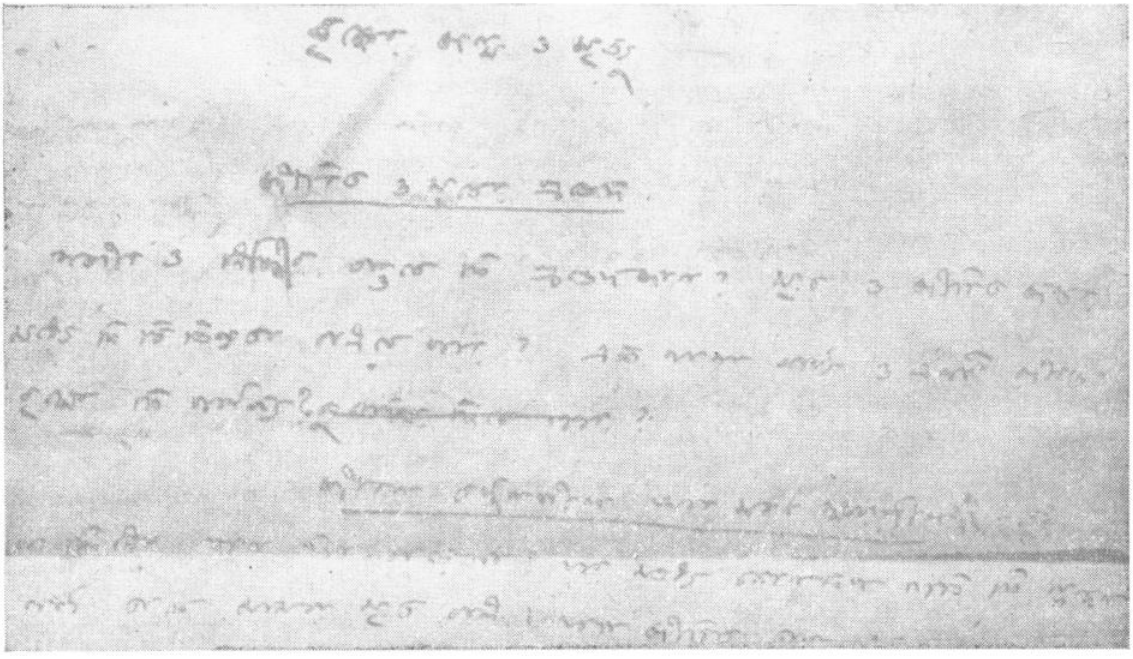

জগদীশচন্দ্র বসু লিখিত মূল পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি। ফটো : কল্যাণ চক্রবর্তী

কে জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না?

যুধিষ্ঠির কহিলেন অণ্ড জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না। জীবিত বস্তু সচরাচর গতিশীল। অণ্ডে জীবন লুক্কায়িত থাকে, অথচ জীবনের লক্ষণ যে গতি ও বৃদ্ধি তাহা দেখা যায় না।

বীজে নিদ্রিত জীবন

যেমন অণ্ডে জীবন ঘুমাইয়া থাকে, উত্তাপ পাইলে অণ্ড হইতে জীবশিশু জন্ম লাভ করে। সেইরূপ বীজে বৃক্ষশিশু লুক্কায়িত থাকে, মৃত্তিকা, উত্তাপ ও জল পাইলে বীজ হইতে বৃক্ষশিশুর জন্ম হয়।

বীজাণুতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ

বীজের উপরে এক কঠিন আবরণ তদ্বারা বৃক্ষশিশু আবৃত থাকে। বীজের আকার নানাপ্রকার, কোনটি অতি ক্ষুদ্র কোনটা অতি বৃহৎ। বীজের আকার হইতে বৃক্ষের আকার নির্ণয় করা যায় না। প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ সরিষার অপেক্ষা ক্ষুদ্র বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। কে মনে করিতে পারে এই ক্ষুদ্র বিন্দুর মধ্যে ভবিষ্যতের প্রকাণ্ড বৃক্ষ লুকাইয়া আছে।

কে বীজ বপন করে?

তোমরা হয়ত কৃষকদিগকে শস্য বপন করিতে দেখিয়াছ। মানুষেরা কেবল বীজ বপন করে এমন নহে। অনেক সময়ে পাখীরা ফল খাইয়া অনেক দূরদেশে বীজ লইয়া যায়। এই প্রকারে সমুদ্রের মধ্যে জনমানব শূন্য দ্বীপে বীজ উপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন অনেক বীজ বাতাসে উড়িয়া অতি দূর দেশে ছড়াইয়া পড়ে। শিমূলফুল যখন পাকিয়া উঠে তখন এক একটি বীজ তুলার উপর ভর করিয়া বাতাসে অনেক দূর চলিয়া যায়। এই প্রকারে দিনরাত্রি দেশ দেশান্তরে বীজ বপন হইতেছে।

প্রত্যেক বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে কিনা কেহ বলিতে পারে না, হয়ত কঠিন প্রস্তরের উপর বীজ পড়িল। সেখানে আর অঙ্কুর বাহির হইতে পারিল না। কঠিন প্রস্তরে কি করিয়া ক্ষুদ্র শিশু পালিত হইবে। অঙ্কুরোদগমের জন্য উত্তাপ, জল ও মৃত্তিকার আবশ্যক

বীজের জীবনী শক্তি

যেখানেই পড়ুক না কেন বহুকাল পর্যন্ত বৃক্ষশিশু বীজের মধ্যে নিরাপদে নিদ্রিত থাকে—যতদিন বাড়িবার উপযুক্ত স্থান না পায় ততদিন উপরকার দৃঢ় আবরণ বর্মের ন্যায় বৃক্ষ শিশুকে বাহিরের বিপদ হইতে রক্ষা করে। শুনিতে পাই মিশর দেশে পিরামিডের মধ্যে শস্যের বীজ পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি প্রায় 6000 বৎসর পুরাতন। সেই বহু পুরাতন বীজ মাটিতে বপন করিলে পর তাহা হইতে শস্য উৎপন্ন হইয়াছে।

'অপার তাহার করুণা'

কি আশ্চর্য কথা! এত সহস্র বৎসর শিশু ঘুমাইয়া ছিল। মৃত্তিকা স্পর্শে জাগিয়া উঠিল। এতদিন কে ইহাদের জীবন রক্ষা করিয়াছিল। কার প্রসাদে মৃত্যু আসিয়া ইহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে নাই। পণ্ডিতেরা বলেন একটি ক্ষুদ্র পক্ষী-শাবকও বিধাতার স্নেহ দৃষ্টির অন্তরালে হয় না। বীজের জীবন একটি পক্ষীর জীবন হইতে অনেক ক্ষুদ্র। পক্ষীরা চেতন, বীজ অচেতন। তবু দেখ বিধাতা তাহার ঘুমন্ত প্রাণটুকুকে কেমন যত্নে রক্ষা করেন।

ধাত্রী ক্রোড়ে শিশু

ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন বীজ পক্ক হয়। আম লিচু প্রভৃতির বীজ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে হয়। ধান, যব ইত্যাদি শস্য আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে পক্ক হয়। মনে কর একটি গাছের বীজ আশ্বিন মাসে পাকিয়াছে। আশ্বিন মাসের শেষে দু-একদিন প্রচণ্ড ঝড় হয়। ঝড়ে গাছগুলি মূল পর্যন্ত কাঁপিতে থাকে, তাহার পাতা ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ভগ্ন হইয়া চারিদিকে পড়িতে থাকে। এই সময়ে বীজগুলিও চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়। প্রবল বাতাসের বেগে কোথায় লইয়া যায় কে বলিতে পারে? মনে কর একটি বীজ সমস্ত দিন রাত্রি মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে একটি মৃত্তিকা স্তূপের নীচে অথবা একখণ্ড ভগ্ন ইষ্টকের নীচে আশ্রয় লইল। কোথায় ছিল, কোথায় আসিয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে ধুলি মৃত্তিকা আসিয়া তাহাকে আচ্ছাদন করিল—এখন হইতে সে মানুষের চক্ষু হইতে অন্তর্ধান হইল।

মনুষ্য চক্ষুর আড়াল হইল বটে কিন্তু বিধাতার চক্ষুর অন্তরালে যায় নাই। পৃথিবী ধাত্রীর ন্যায় তাহাকে ক্রোড়ে লইল। সে মৃত্তিকার আবরণে বাহিরের শীত ও ঝঞ্ঝাপাত হইতে রক্ষা পাইল। এখন অদৃশ্য হইয়া বীজটি নিদ্রিত হইয়া রহিল। মাসের পর মাস কাটিয়া গেল, শীত অবসানে বসন্ত আসিল। তারপর বর্ষার আরম্ভে দু'একদিন বৃষ্টি হইল। জল স্পর্শে ঘুমন্ত শিশু জাগিয়া উঠিল। এখন আর লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। বাহিরের আলোক ··কে যেন শিশুকে বলিতেছে "আলোকে আইস" উপরে সূর্যকিরণ দেখিবে। আর ঘুমাইও না।" আস্তে আস্তে বীজের বাহিরের আবরণটি খসিয়া পড়িল, দুটি কোমল পল্লবের মধ্য হইতে অঙ্কুর বাহির হইল। অঙ্কুরের এক অংশ নীচের দিকে যাইয়া মৃত্তিকা দৃঢ়রূপে ধরিয়া রহিল। আর এক অংশ মাটি ভেদ করিয়া আলো লক্ষ্য করিয়া উপরে উঠিল। তোমরা কি অঙ্কুর উঠিতে দেখিয়াছ? মনে হয়, শিশুটি যেন ক্ষুদ্র মস্তক তুলিয়া বিস্ময়ের সহিত নতুন রাজ্যে উঁকি দিয়া দেখিতেছে।

[শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান ১৩৮৯ থেকে পুনর্মুদ্রিত।]

জগদীশচন্দ্র বসুর অপ্রকাশিত রচনা

[সংগ্রহ সূত্র : আচার্য জগদীশচন্দ্র বাংলা 1328 সালে 'অব্যক্ত' গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন এবং রবীন্দ্রনাথকে একখানি 'অব্যক্ত' উপহার পাঠান। সাথে একখানি চিঠিও।

কলিকাতা 3রা অগ্রহায়ণ, 1328

বন্ধু,

সুখে দুঃখে কত বৎসরের স্মৃতি তোমার সহিত জড়িত। অনেক সময় সে সব কথা মনে পড়ে। আজ জোনাকির আলো রবির প্রখর আলোর নিকট পাঠাইলাম।

তোমার জগদীশ।

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "……যদিও বিজ্ঞান-বাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরাণী করিয়াছ তবু সাহিত্য সরস্বতী সে পদের দাবি করিতে পারিত—কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃত হইয়া আছে।"

জগদীশচন্দ্রের লেখা সেকালে 'সঞ্জীবনী', ভারতবর্ষ', 'দাসী', 'সাহিত্য', 'প্রবাসী', 'মোসলেম ভারত', 'মুকুল', প্রভৃতি আরও অনেক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুকুল পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে জগদীশ চন্দ্রের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। জগদীশচন্দ্রের বোন সেকালের লেখিকা লাবণ্যপ্রভা বসু, কুমুদিনী খাস্তগীর, কবি কামিনী (সেন) রায়—এদের উদ্যোগে একটি নীতি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই নীতি বিদ্যালয়টি ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত ছিল। এই নীতি বিদ্যালয়ের উৎসাহে মুকুল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির নামকরণ করেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। পত্রিকাটির শৈশব অবস্থায় জগদীশচন্দ্র বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের উদ্যোগে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কিছুকাল সম্পাদকের কাজ চালান। তাঁর সাহায্যকারী হিসেবে ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। এই মুকুল পত্রিকাতে তিনি 'গাছের কথা' ও 'উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু' প্রবন্ধ দুটি শিশুদের জন্য লেখেন। বাংলা 1302 সালের আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রবন্ধ দুটি প্রকাশিত হয়। পরে দুটি প্রবন্ধই 'অব্যক্ত' গ্রন্থে স্থান পায়।

নিচের এই অপ্রকাশিত প্রবন্ধটি গাছের কথা ও উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু প্রবন্ধের আদিরূপ। রচনাটি তিনি শুরু করেছিলেন পৌরাণিক কাহিনী দিয়ে। কিন্তু মুকুলে প্রকাশকালে সম্ভবত সম্পাদক কিম্বা বোন লাবণ্যপ্রভার তাগিদে বড় প্রবন্ধ প্রকাশের প্রয়োজনে এই মূল প্রবন্ধকে ভেঙ্গে মার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে 'গাছের কথা' ও 'উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু' এই দুটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধ দুটি পর পর মুদ্রিত হল।

সংকলন ও সম্পাদনা : দিবাকর সেন

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা—ভগবানচন্দ্র বসু মাতা—বামাসুন্দরী বসু

গাছের কথা

জগদীশচন্দ্র বসু

গাছেরা কি কিছু বলে? অনেকে বলিবেন, এ আবার কেমন প্রশ্ন? গাছ কি কোনো দিন কথা কহিয়া থাকে? মানুষেই কি সব কথা ফুটিয়া বলে? আর যাহা ফুটিয়া বলে না, তাহা কি কথা নয়? আমাদের একটি খোকা আছে, সে সব কথা ফুটিয়া বলিতে পারে না; আবার ফুটিয়া যে দুই চারিটি কথা বলে, তাহাও এমন আধো-আধো ও ভাঙা ভাঙা যে, অপরের সাধ্য নাই তাহার অর্থ বুঝিতে পারে! কিন্তু আমরা আমাদের খোকার সকল সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারি। কেবল তাহা নয়। আমাদের খোকা অনেক কথা ফুটিয়া বলে না; চক্ষু, মুখ ও হাত নাড়া, মাথা নাড়া প্রভৃতির দ্বারা আকার ইঙ্গিতে অনেক কথা বলে, আমরা তাহাও বুঝিতে পারি, অন্যে বুঝিতে পারে না। একদিন পার্শ্বের বাড়ি হইতে একটি পায়রা উড়িয়া আসিয়া আমাদের বাড়িতে বসিল; বসিয়া গলা ফুলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। পায়রার সঙ্গে খোকার নূতন পরিচয়; খোকা তাহার অনুকরণে ডাকিতে আরম্ভ করিল। 'পায়রা কি-রকম ভাবে ডাকে?' বলিলেই ডাকিয়া দেখায়; তদ্‌ভিন্ন সুখে দুঃখে, চলিতে বসিতে, আপনার মনেও ডাকে। নূতন বিদ্যাটা শিখিয়া তাহার আনন্দের সীমা নাই!

একদিন বাড়ি আসিয়া দেখি, খোকার বড়ো জ্বর হইয়াছে; মাথার বেদনায় চক্ষু মুদিয়া বিছানায় পড়িয়া আছে। যে দুরন্ত শিশু সমস্ত দিন বাড়ি অস্থির করিয়া তুলিত, সে আজ একবার চক্ষু খুলিয়াও চাহিতেছে না। আমি তাহার বিছানার পাশে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম। আমার হাতের স্পর্শে খোকা আমাকে চিনিল, এবং অতি কষ্টে চক্ষু খুলিয়া আমার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার পর পায়রার ডাক ডাকিল। ঐ ডাকের ভিতর আমি অনেক কথা শুনিলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম, খোকা বলিতেছে, 'খোকাকে দেখিতে আসিয়াছ? খোকা তোমাকে বড়ো ভালোবাসে।' আরও অনেক কথা বুঝিলাম, যাহা আমিও কোনো কথার দ্বারা বুঝাইতে পারি না।

যদি বল, পায়রার ডাকের ভিতর এত কথা কি করিয়া শুনিলে? তাহার উত্তর এই খোকাকে ভালবাসি বলিয়া। তোমরা দেখিয়াছ, ছেলের মুখ দেখিয়া মা বুঝিতে পারেন ছেলে কি চায়। অনেক সময় কথারও আবশ্যক হয় না। ভালোবাসিয়া দেখিলেই অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

আগে যখন একা মাঠে কিংবা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম, তখন সব খালি-খালি লাগিত। তার পর গাছ, পাখি, কীট পতঙ্গদিগকে ভালোবাসিতে শিখিয়াছি, সে অবধি তাদের অনেক কথা বুঝিতে পারি, আগে যাহা পারিতাম না। এই যে গাছগুলি কোনো কথা বলে না, ইহাদের যে আবার একটা জীবন আছে, আমাদের মতো আহার করে, দিন দিন বাড়ে, আগে এ সবকিছুই জানিতাম না। এখন বুঝিতে পারিতেছি। এখন ইহাদের মধ্যেও আমাদের মতো অভাব, দুঃখ-কষ্ট দেখিতে পাই। জীবনধারণ করিবার জন্য ইহাদিগকেও সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। কষ্টে পড়িয়া ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ চুরি ডাকাতি করে। মানুষের মধ্যে যেরূপ সদ্‌গুণ আছে, ইহাদের মধ্যেও তাহাদের কিছু কিছু দেখা যায়। বৃক্ষদের মধ্যে একে অন্যকে সাহায্য করতে দেখা যায়, ইহাদে মধ্যে একের সহিত অপরের বন্ধুতা হয়। তার পর মানুষের সর্বোচ্চ গুণ যে স্বার্থ ত্যাগ, গাছে তাহাও দেখা যায়। মা নিজের জীবন দিয়া সন্তানের জীবন রক্ষা করেন। সন্তানের জন্য নিজের জীবন দান উদ্ভিদেও সচরাচর দেখা যায়। গাছের জীবন মানুষের জীবনের ছায়ামাত্র। ক্রমে এ সব কথা তোমাদিগকে বলিব।

তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল সকলেই দেখিয়াছ। মনে কর, কোনো গাছের তলাতে বসিয়াছ। ঘন সবুজ পাতায় গাছটি ঢাকা, ছায়াতে তুমি বসিয়াছ। গাছের নীচে এক পার্শ্বে এক খানি শুষ্ক ডাল পড়িয়া আছে। এক সময় এই ডালে কত পাতা ছিল, এখন সব শুকাইয়া গিয়াছে, আর ডালের গোড়ায় উই ধরিয়াছে। আর কিছুকাল পরে ইহার চিহ্নও থাকিবে না। আচ্ছা, বলো তো এই গাছ আর মরাডালে কি প্রভেদ? গাছটি বাড়িতেছে, আর মরা ডালটা ক্ষয় হইয়া যাইতেছে; একে জীবন আছে, অন্যটিতে জীবন নাই। যাহা জীবিত তাহা ক্রমশ বাড়িতে থাকে। জীবিতের আর একটি লক্ষণ এই যে তাহার গতি আছে, অর্থাৎ তাহারা নড়ে চড়ে। গাছের গতি হঠাৎ দেখা যায় না। লতা কেমন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাছকে জড়াইয়া ধরে, দেখিয়াছ?

জীবিত বস্তুতে গতি দেখা যায়; জীবিত বস্তু বাড়িয়া থাকে। কেবল ডিমে জীবনের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। ডিমে জীবন ঘুমাইয়া থাকে। উত্তাপ পাইলে ডিম হইতে পাখির ছানা জন্মলাভ করে। বীজগুলি যেন গাছের ডিম; বীজের মধ্যেও এরূপ গাছের শিশু ঘুমাইয়া থাকে। মাটি, উত্তাপ ও জল পাইলে বীজ হইতে বৃক্ষ-শিশুর জন্ম হয়।

বীজের উপর এক কঠিন ঢাক্‌না ; তাহার মধ্যে বৃক্ষ-শিশু নিরাপদে নিদ্রা যায়। বীজের আকার নানাপ্রকার, কোনোটি অতি ছোটো, কোনোটি বড়ো। বীজ দেখিয়া গাছ কত বড়ো হইবে বলা যায় না। অতি প্রকাণ্ড বট গাছ, সরিষা অপেক্ষা ছোটো বীজ হইতে জন্মে। কে মনে করিতে পারে, এত বড়ো গাছটা এই ক্ষুদ্র সরিষার মধ্যে লুকাইয়া আছে? তোমরা হয়তো কৃষকদিগকে ধানের বীজ ক্ষেতে ছড়াইতে দেখিয়াছ। কিন্তু যত গাছ পালা, বন-জঙ্গল দেখ, তাহার অনেকের বীজ মানুষ ছড়ায় নাই। নানা উপায়ে গাছের বীজ ছড়াইয়া যায়। পাখিরা ফল খাইয়া দূর দেশে বীজ লইয়া যায়। এই প্রকারে জনমানবশূন্য দ্বীপে গাছ জন্মিয়া থাকে। ইহা ছাড়া অনেক বীজ বাতাসে উড়িয়া অনেক দূর দেশে ছড়াইয়া পড়ে। শিমুল গাছ অনেকে দেখিয়াছ। শিমুল-ফল যখন রৌদ্রে ফাটিয়া যায় তখন তাহার মধ্য হইতে বীজ তুলার সঙ্গে উড়িতে থাকে। ছেলেবেলায় আমরা এই সকল বীজ ধরিবার জন্য ছুটিতাম ; হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলেই বাতাস তুলার সহিত বীজকে অনেক উপরে লইয়া যাইত। এই প্রকারে দিন-রাত্রি দেশ-দেশান্তরে বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রত্যেক বীজ হইতে গাছ জন্মে কি না, কেহ বলিতে পারে না। হয়তো কঠিন পাথরের উপর বীজ পড়িল, সেখানে তার অঙ্কুর বাহির হইতে পারিল না। অঙ্কুর বাহির হইবার জন্য উত্তাপ, জল ও মাটি চাই।

যেখানেই বীজ পড়ুক না কেন, বৃক্ষ-শিশু অনেক দিন পর্যন্ত বীজের মধ্যে নিরাপদে ঘুমাইয়া থাকে। বাড়িবার উপযুক্ত স্থানে যতদিন না পড়ে, ততদিন বাহিরের কঠিন ঢাক্‌না গাছের শিশুটিকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করে।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বীজ পাকিয়া থাকে। আম, লিচুর বীজ বৈশাখ মাসে পাকে ; ধান, যব ইত্যাদি আশ্বিন কার্তিক মাসে পাকিয়া থাকে। মনে কর, একটি গাছের বীজ আশ্বিন মাসে পাকিয়াছে। আশ্বিন মাসের শেষে বড়ো ঝড় হয়। ঝড়ে পাতা ও ছোটো ছোটো ডাল ছিঁড়িয়া চারি দিকে পড়িতে থাকে। এইরূপে বীজ গুলি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। প্রবল বাতাসের বেগে কোথায় উড়িয়া যায়, কে বলিতে পারে? মনে কর, একটি বীজ সমস্ত দিন-রাত্রি মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে একখানা ভাঙা ইট কিংবা মাটির ডেলার নীচে আশ্রয় লইল। কোথায় ছিল, কোথায় আসিয়া পড়িল। ক্রমে ধুলা ও মাটিতে বীজটি ঢাকা পড়িল। এখন বীজটি মানুষের চক্ষুর আড়াল হইল। আমাদের দৃষ্টি হইতে দূরে গেল বটে, কিন্তু বিধাতার দৃষ্টির বাহিরে যায় নাই। পৃথিবী মাতার ন্যায় তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। বৃক্ষ-শিশুটি মাটিতে ঢাকা পড়িয়া বাহিরের শীত ও ঝড় হইতে রক্ষা পাইল। এইরূপে নিরাপদে বৃক্ষ-শিশুটি ঘুমাইয়া রহিল।

উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু

জগদীশচন্দ্র বসু

মৃত্তিকার নীচে অনেক দিন বীজ লুকাইয়া থাকে। মাসের পর মাস এইরূপে কাটিয়া গেল। শীতের পর বসন্ত আসিল। তার পর বর্ষার আরম্ভে দুই-এক দিন বৃষ্টি হইল। এখন আর লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। বাহির হইতে কে যেন শিশুকে ডাকিয়া বলিতেছে, 'আর ঘুমাইয়ো না, উপরে উঠিয়া আইস, সূর্যের আলো দেখিবে।' আস্তে আস্তে বীজের ঢাক্‌নাটি খসিয়া পড়িল, দুইটি কোমল পাতার মধ্য হইতে অঙ্কুর বাহির হইল! অঙ্কুরের এক অংশ নীচের দিকে গিয়া দৃঢ়রূপে মাটি ধরিয়া রহিল, আর এক অংশ মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। তোমরা কি অঙ্কুর উঠিতে দেখিয়াছ? মনে হয় শিশুটি যেন ছোটো মাথা তুলিয়া আশ্চর্যের সহিত নূতন দেশ দেখিতেছে।

গাছের অঙ্কুর বাহির হইলে যে অংশ মাটির ভিতর প্রবেশ করে, তাহার নাম মূল। আর যে অংশ উপরের দিকে বাড়িতে থাকে, তাহাকে বলে কাণ্ড। সকল গাছেই 'মূল' আর 'কাণ্ড' এই দুই ভাগ দেখিবে। এই এক আশ্চর্যের কথা, গাছকে যেরূপেই রাখ, মূল নীচের দিকে ও কাণ্ড উপরের দিকে যাইবে। একটি টবে গাছ ছিল। পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েক দিন ধরিয়া টবটিকে উল্টা করিয়া ঝুলাইয়া রাখিলাম। গাছের মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়া রহিল আর শিকড় উপরের দিকে পড়িতে থাকে। এইরূপে বীজগুলি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। প্রবল বাতাসের বেগে কোথায় উড়িয়া যায়, কে বলিতে পারে? মনে কর, একটি বীজ সমস্ত দিন-রাত্রি মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে একখানা ভাঙা ইট কিংবা মাটির ডেলার নীচে আশ্রয় লইল। কোথায় ছিল, কোথায় আসিয়া পড়িল। ক্রমে ধুলা ও মাটিতে বীজটি ঢাকা পড়িল। এখন বীজটি মানুষের চক্ষুর আড়াল হইল। আমাদের দৃষ্টি হইতে দূরে গেল বটে, কিন্তু তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। বৃক্ষ-শিশুটি মাটিতে ঢাকা পড়িয়া বাহিরের শীত ও ঝড় হইতে রক্ষা পাইল। এইরূপে নিরাপদে বৃক্ষ-শিশুটি ঘুমাইয়া রহিল।

দুই-এক দিন পরে দেখিতে পাইলাম যে, গাছ যেন টের পাইয়াছে। তাহার সব ডালগুলি বাঁকা হইয়া উপরের দিকে উঠিল ও মূলটি ঘুরিয়া নীচের দিকে

নামিয়া গেল। তোমরা অনেকে শীতকালে অনেক বার মূলা কাটিয়া শয়তা করিয়া থাকিবে। দেখিয়াছ, প্রথমে শয়তার পাতাগুলি ও ফুল নীচের দিকে থাকে। কিছুদিন পরে দেখিতে পাওয়া যায়, পাতা ও ফুলগুলি উপর দিকে উঠিয়াছে।

আমরা যেরূপ আহার করি, গাছও সেইরূপ আহার করে। আমাদের দাঁত আছে, আমরা কঠিন জিনিস খাইতে পারি। ছোটো ছোটো শিশুদের দাঁত নাই; তাহারা কেবল দুধ খায়। গাছেরও দাঁত নাই, সুতরাং তাহারা কেবল জলীয় দ্রব্য কিংবা বাতাস হইতে আহার গ্রহণ করিতে পারে। মূল দ্বারা মাটি হইতে গাছ রস শোষণ করে। চিনিতে জল ঢালিলে চিনি গলিয়া যায়। মাটিতে জল ঢালিলে মাটির ভিতরের অনেক জিনিস গলিয়া যায়। গাছ সেই সব জিনিস আহার করে। গাছের গোড়ায় জল না দিলে গাছের আহার বন্ধ হইয়া যায়, ও গাছ মরিয়া যায়।

অণুবীক্ষণ দিয়া অতি ক্ষুদ্র পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের ডাল কিংবা মূল এই যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, গাছের মধ্যে হাজার হাজার নল আছে। এইসব নল দ্বারা মাটি হইতে গাছের শরীরে রস প্রবেশ করে।

এ ছাড়া গাছের পাতা বাতাস হইতে আহার সংগ্রহ করে। পাতার মধ্যে অনেকগুলি ছোটো ছোটো মুখ আছে। অণুবীক্ষণ দিয়া এই সব মুখে ছোটো ছোটো ঠোঁট দেখা যায়। যখন আহার করিবার আবশ্যক হয় না তখন ঠোঁট দুইটি বুজিয়া যায়। আমরা যখন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করি তখন প্রশ্বাসের সঙ্গে এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু বাহির হইয়া যায়; তাহাকে অঙ্গারক বায়ু বলে। ইহা যদি পৃথিবীতে জমিতে থাকে তবে সকল জীবজন্তু অল্প-দিনের মধ্যে এই বিষাক্ত বায়ু গ্রহণ করিয়া মরিয়া যাইতে পারে। বিধাতার করুণার কথা ভাবিয়া দেখ। যাহা জীবজন্তুর পক্ষে বিষ, গাছ তাহাই আহার করিয়া বাতাস পরিষ্কার করিয়া দেয়। গাছের পাতার উপর যখন সূর্যের আলোক পড়ে, তখন পাতাগুলি সূর্যের তেজের সাহায্যে অঙ্গারক বায়ু হইতে অঙ্গার বাহির করিয়া লয়। এই অঙ্গার গাছের শরীরে প্রবেশ করিয়া গাছকে বাড়াইতে থাকে। গাছেরা আলো চায়. আলো না হইলে ইহারা বাঁচিতে পারে না। গাছের সর্বপ্রধান চেষ্টা, কি করিয়া একটু আলো পাইবে। যদি জানালার কাছে টবে গাছ রাখ, তবে দেখিবে, সমস্ত ডালগুলি অন্ধকার দিক্ ছাড়িয়া আলোর দিকে যাইতেছে। বনে যাইয়া দেখিবে, গাছগুলি তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া কে আগে আলোক পাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতেছে। লতাগুলি ছায়াতে পড়িয়া থাকিলে আলোর অভাবে মরিয়া যাইবে, এইজন্য তাহারা গাছ জড়াইয়া ধরিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে।

এখন বুঝিতে পারিতেছ, আলোই জীবনের মূল। সূর্যের কিরণ শরীরে ধারণ করিয়াই গাছ বাড়িতে থাকে। গাছের শরীরে সূর্য্যের কিরণ আবদ্ধ হইয়া আছে। কাঠে আগুন ধরাইয়া দিলে যে আলো ও তাপ বাহির হয়, তাই সূর্যেরই তেজ। গাছ ও তাহার শস্য আলো ধরিবার ফাঁদ। জন্তুরা গাছ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে; গাছে যে সূর্যের তেজ আছে তাহা এই প্রকারে জন্তুর শরীরে প্রবেশ করে। শস্য আহার না করিলে আমরাও বাঁচিতে পারিতাম না। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, আমরাও আলো আহার করিয়া বাঁচিয়া আছি।

কোনো কোনো গাছ এক বৎসরের পরেই মরিয়া যায়। সব গাছই মরিবার পূর্বে সন্তান রাখিয়া যাইতে ব্যগ্র হয়। বীজগুলিই গাছের সন্তান। বীজ রক্ষা করিবার জন্য ফুলের পাপড়ি দিয়া গাছ একটি ক্ষুদ্র ঘর প্রস্তুত করে। গাছ যখন ফুলে ঢাকিয়া থাকে, তখন কেমন সুন্দর দেখায়। মনে হয়, গাছ যেন হাসিতেছে। ফুলের ন্যায় সুন্দর জিনিস আর কি আছে? গাছ তো মাটি হইতে আহার লয়, আর বাতাস হইতে অঙ্গার আহরণ করে। এই সামান্য জিনিস দিয়া কি করিয়া এরূপ সুন্দর ফুল হইল? গল্পে শুনিয়াছি, স্পর্শমণি নামে এক প্রকার মণি আছে, তাহা ছোঁয়াইলে লোহা সোনা হইয়া যায়। আমার মনে হয়, মাতার স্নেহই সেই মণি। সন্তানের উপর ভালো-বাসাটাই যেন ফুলে ফুটিয়া উঠে। ভালোবাসার স্পর্শেই যেন মাটি এবং অঙ্গার ফুল হইয়া যায়।

গাছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিলে আমাদের মনে কত আনন্দ হয়। বোধ হয় গাছেরও যেন কত আনন্দ। আনন্দের দিনে আমরা দশজনকে নিমন্ত্রণ করি। ফুল ফুটিলে গাছও তাহার বন্ধু বান্ধবদিগকে ডাকিয়া আনে। গাছ যেন ডাকিয়া বলে 'কোথায় আমার বন্ধু বান্ধব, আজ আমার বাড়িতে এসো। যদি পথ ভুলিয়া যাও বাড়ি যদি চিনিতে না পার, সেজন্য নানা রঙের ফুলের নিশান তুলিয়া দিয়াছি। এই রঙিন পাপড়িগুলি দূর হইতে দেখিতে পাইবে।' মৌমাছি ও প্রজাপতির সহিত গাছের চিরকাল বন্ধুতা। তাহারা দলে দলে ফুল দেখিতে আসে। কোনো কোনো পতঙ্গ দিনের বেলায় পাখির ভয়ে বাহির

হইতে পারে না। পাখি তাহাদিগকে দেখিলেই খাইয়া ফেলে। কাজেই রাত্রি না হইলে তাহারা বাহির হইতে পারে না। সন্ধ্যা হইলেই তাহাদিগকে আনিবার জন্য ফুল চারি দিকে সুগন্ধ বিস্তার করে।

গাছ ফুলের মধ্যে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে। মৌমাছি ও প্রজাপতি সেই মধু পান করিয়া যায়। মৌমাছি আসে বলিয়া গাছেরও উপকার হয়। ফুলে তোমরা রেণু দেখিয়া থাকিবে। মৌমাছিরা এক ফুলের রেণু অন্য ফুলে লইয়া যায়। রেণু ভিন্ন বীজ পাকিতে পারে না।

এইরূপে ফুলের মধ্যে বীজ পাকিয়া থাকে। শরীরের রস দিয়া গাছ বীজগুলিকে লালনপালন করিতে থাকে। নিজের জীবনের জন্য এখন আর মায়া করে না। তিল তিল করিয়া সন্তানের জন্য সমস্ত বিলাইয়া দেয়। যে শরীর কিছু দিন পূর্বে সতেজ ছিল, এখন তাহা একেবারে শুকাইয়া যাইতে থাকে। শরীরের ভার বহন করিবারও আর শক্তি থাকে না। আগে বাতাস হু-হু করিয়া পাতা নড়াইয়া চলিয়া যাইত। পাতাগুলি বাতাসের সঙ্গে খেলা করিত; ছোটো ডালগুলি তালে তালে নাচিত। এখন শুষ্ক গাছটি বাতাসের ভর সহিতে পারে না। বাতাসের এক-একটি ঝাপ্‌টা লাগিলে গাছটি থর-থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। একটি একটি করিয়া ডালগুলি ভাঙিয়া পড়িতে থাকে। শেষে একদিন হঠাৎ গোড়া ভাঙিয়া গাছ মাটিতে পড়িয়া যায়।

এইরূপে সন্তানের জন্য নিজের জীবন দিয়া গাছ মরিয়া যায়।

[বৃক্ষের জন্ম ও মৃত্যু রচনাটির পরিমার্জিত রূপ]

1928 সালে তোলা জগদীশচন্দ্র ও তাঁর ছাত্রবৃন্দ

পিছনের সারি : বাঁ দিক থেকে : এন. সি. নাগ, জে. সি. ঘোষ, আচার্য জগদীশচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা ও এস্. দত্ত।
সামনের সারি : বাঁ দিক থেকে : এস. আর. সেন, জে. এন. মুখার্জী, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রমোহন বসু।

অদৃশ্য আলোক

জগদীশচন্দ্র বসু

সেতারের তার অঙ্গুলিতাড়নে ঝংকার দিয়া উঠে। দেখা যায়, তার কাঁপিতেছে। সেই কম্পনে বায়ুরাশিতে অদৃশ্য ঢেউ উৎপন্ন হয় এবং তাহার আঘাতে কর্ণেন্দ্রিয়ে সুর উপলব্ধি হয়। এইরূপে তিনের সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদ প্রেরিত ও উপলব্ধ হইয়া থাকে —প্রথমতঃ শব্দের উৎস ঐ কম্পিত তার, দ্বিতীয়তঃ পরিবাহক বায়ু এবং তৃতীয়তঃ শব্দবোধক কর্ণেন্দ্রিয়।

সেতারের তার যতই ছোটো করা যায়, সুর ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তমে উঠিয়া থাকে। এইরূপে বায়ু-স্পন্দন প্রতি সেকেণ্ডে 30,000 বার হইলে অসহ্য উচ্চ সুর শোনা যায়। তার আরও খাটো করিলে সুর আর শুনিতে পাই না। তার তখনও কম্পিত হইতেছে, কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় সেই অতি উচ্চ সুর উপলব্ধি করিতে পারে না। শ্রবণ করিবার উপরের দিকে যেরূপ এক সীমা আছে, নীচের দিকেও সেইরূপ। স্থূল তার কিংবা ইস্পাত আঘাত করিলে অতি ধীর স্পন্দন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোনো শব্দ শোনা যায় না। কম্পন সংখ্যা 16 হইতে 30,000 পর্যন্ত হইলে তাহা শ্রুত হয়; অর্থাৎ আমাদের শ্রবণশক্তি একাদশ সপ্তকের মধ্যে আবদ্ধ। কর্ণেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা হেতু অনেক সুর আমাদের নিকট অশব্দ।

বায়ুরাশির কম্পনে যেরূপ শব্দ উৎপন্ন হয়, আকাশ স্পন্দনেও সেইরূপ আলো উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা হেতু একাদশ সপ্তক সুর শুনিতে পাই। কিন্তু দর্শণেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা আরও অধিক; আকাশের অগণিত সুরের মধ্যে এক সপ্তক সুরমাত্র দেখিতে পাই। আকাশ স্পন্দন প্রতি সেকেণ্ডে চারি শত লক্ষ কোটি বার হইলে চক্ষু তাহা রক্তিম আলো বলিয়া উপলব্ধি করে; কম্পন-সংখ্যা দ্বিগুণিত হইলে বেগুনী রঙ দেখিতে পাই। পীত, সবুজ ও নীলালোক এই এক সপ্তকের অন্তর্ভুক্ত। কম্পন-সংখ্যা চারি শত লক্ষ কোটির ঊর্ধ্বে উঠিলে চক্ষু পরাস্ত হয় এবং দৃশ্য তখন অদৃশ্যে মিলাইয়া যায়।

আকাশ-স্পন্দনেই আলোর উৎপত্তি, তাহা দৃশ্যই হউক অথবা অদৃশ্যই হউক। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই অদৃশ্য রশ্মি কি করিয়া ধরা যাইতে পারে, আর এই রশ্মি যে আলো তাহার প্রমাণ কি? এ বিষয়ের পরীক্ষা বর্ণনা করিব। জার্মান অধ্যাপক হার্টজ সর্বপ্রথমে বৈদ্যুতিক উপায়ে আকাশে ঊর্মি উৎপাদন করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার ঢেউগুলি অতি বৃহদাকার বলিয়া সরল রেখায় ধাবিত না হইয়া বক্র হইয়া যাইত। দৃশ্য আলোক-রশ্মির সম্মুখে একখানি ধাতুফলক ধরিলে পশ্চাতে ছায়া পড়ে; কিন্তু আকাশের বৃহদাকার ঢেউগুলি ঘুরিয়া বাধার পশ্চাতে পৌঁছিয়া থাকে। জলের বৃহৎ ঊর্মির সম্মুখে উপলখণ্ড ধরিলে এইরূপ হইতে দেখা যায়। দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই তাহা সূক্ষ্মরূপে প্রমাণ করিতে হইলে অদৃশ্য আলোর ঊর্মি খর্ব করা আবশ্যক। আমি যে কল নির্মাণ করিয়াছিলাম তাহা হইতে উৎপন্ন আকাশোর্মির দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই কলে একটি ক্ষুদ্র লণ্ঠনের ভিতরে তড়িতোর্মি উৎপন্ন হয়। এক দিকে একটি খোলা নল; তাহার মধ্য দিয়া অদৃশ্য আলো বাহির হয়। এই আলো আমরা দেখিতে পাই না, হয়তো অন্য কোনো জীবে দেখিতে পায়। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, এই আলোকে উদ্ভিদ্ উত্তেজিত হইয়া থাকে।

অদৃশ্য আলো দেখিবার জন্য কৃত্রিম চক্ষু নির্মাণ করা আবশ্যক। আমাদের চক্ষুর পশ্চাতে স্নায়ু-নির্মিত একখানি পর্দা আছে; তাহার উপর আলো পতিত হইলে স্নায়ুসূত্র দিয়া উত্তেজনা-প্রবাহ মস্তিষ্কের বিশেষ অংশকে আলোড়িত করে এবং সেই আলোড়ন আলো বলিয়া অনুভব করি। কৃত্রিম চক্ষুর গঠন খানিকটা ঐরূপ। দুইখানি ধাতুখণ্ড পরস্পরের সহিত স্পর্শ করিয়া আছে। সংযোগস্থলে অদৃশ্য আলো পতিত হইলে সহসা আণবিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে এবং তাহার ফলে বিদ্যুৎস্রোত বহিয়া চুম্বকের কাঁটা নাড়িয়া দেয়। বোবা যেরূপ হাত নাড়িয়া সংকেত করে, অদৃশ্য আলো দেখিতে পাইলে কৃত্রিম চক্ষুও সেইরূপ কাঁটা নাড়িয়া আলোর উপলব্ধি জ্ঞাপন করে।

আলোর সাধারণ প্রকৃতি

এখন দেখা যাউক, দৃশ্য এবং অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি একবিধ অথবা বিভিন্ন। দৃশ্য আলোকের প্রকৃতি এই যে—

1. ইহা সরল রেখায় ধাবিত হয়।

2. ধাতুনির্মিত দর্পণে পতিত হইলে আলো প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। রশ্মি প্রতিফলিত হইবারও একটা বিশেষ নিয়ম আছে।

3. আলোর আঘাতে আণবিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য আলো-আহত পদার্থের স্বাভাবিক গুণ পরিবর্তিত হয়। ফোটোগ্রাফের প্লেটে যে ছবি পড়ে

তাহাতে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং ডেভেলপার ঢালিলে ছবি ফুটিয়া উঠে।

4. সব আলোর রঙ এক নহে ; কোনো আলো লাল, কোনোটা পীত কোনোটা সবুজ এবং কোনোটা নীল। বিভিন্ন পদার্থ নানা রঙের পক্ষে স্বচ্ছ কিংবা অস্বচ্ছ।

5. আলো বায়ু হইতে অন্য কোনো স্বচ্ছ পদার্থের উপর পতিত হইলে বক্রীভূত হয়। আলোর রশ্মি ত্রিকোণ কাচের উপর ফেলিলে ইহা স্পষ্টত দেখা যায়। কাচ-বর্তুলের ভিতর দিয়া আলো অক্ষীণভাবে দূরে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

6. আলোর ঢেউয়ে সচরাচর কোনো শৃঙ্খলা নাই ; উহা সর্বমুখী ; অর্থাৎ কখনও ঊর্ধ্বাধঃ কখনও বা দক্ষিণে বামে স্পন্দিত হয়। স্ফটিকজাতীয় পদার্থ দ্বারা আলোক-রশ্মির স্পন্দন শৃঙ্খলিত করা যাইতে পারে ; তখন স্পন্দন বহুমুখী না হইয়া একমুখী হয়। একমুখী আলোর বিশেষ ধর্ম পরে বলিব।

দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই রূপ, এক্ষণে সেই পরীক্ষা বর্ণনা করিব।

প্রথমতঃ, অদৃশ্য আলোক যে সোজা পথে চলে তাহার প্রমাণ এই যে, বিদ্যুতোর্মি বাহির হইবার জন্য লণ্ঠনে যে নল আছে সেই নলের সম্মুখে সোজা লাইনে কৃত্রিম চক্ষু ধরিলে কাঁটা নড়িয়া উঠে। চক্ষুটিকে এক পাশে ধরিলে কোনো উত্তেজনার চিহ্ন দেখা যায় না।

দর্পণে যেরূপ দৃশ্য আলো প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে এবং সেই প্রত্যাবর্তন যে নিয়মাধীন, অদৃশ্য আলোকও সেইরূপে এবং সেই নিয়মে প্রতিহত হইয়া প্রত্যাবর্তন করে।

দৃশ্য আলোর আঘাতে আণবিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। অদৃশ্য আলোকও যে আণবিক পরিবর্তন ঘটায় তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

আলোর বিবিধ বর্ণ

পূর্বে বলিয়াছি যে, দৃশ্য আলোক নানা বর্ণের। অনুভূতির দ্বারা বর্ণের বিভিন্নতা সহজেই ধরিতে পারি ; কিন্তু বর্ণের বিভিন্নতা অনেকেই ধরিতে পারেন না। তাঁহারা বর্ণ সম্বন্ধে অন্ধ। বর্ণের বিভিন্নতা অন্য উপায়ে ধরা যাইতে পারে ; সে বিষয় পরে বলিব। এইখানে বলা আবশ্যক যে, মানুষের দৃষ্টি-সীমার ক্রমবিকাশ হইতেছে। বহু পূর্বপুরুষদের বর্ণজ্ঞান সংকীর্ণ ছিল, তাহা অন্ততঃ এক দিকে প্রসারিত হইয়াছে। আর অন্য দিকেও কোনোদিন প্রসারিত হইবে। তাহা হইলে এখন যাহা অদৃশ্য তখন তাহা দৃশ্যের মধ্যে আসিবে।

সে যাহা হউক, অদৃশ্য আলোর রঙ সম্বন্ধে কয়েকটি অদ্ভুত পরীক্ষা বর্ণনা করিব। জানালার কাচের কোনো বিশেষ রঙ নাই, সূর্যের আলো উহার ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যায়। সুতরাং দৃশ্য আলোর পক্ষে কাচ স্বচ্ছ, জলও স্বচ্ছ। কিন্তু ইট-পাটকেল অস্বচ্ছ, আলকাতরা তদপেক্ষা অস্বচ্ছ। দৃশ্য আলোকের কথা বলিলাম। অদৃশ্য আলোকের সম্মুখে জানালার কাচ ধরিলে তাহার ভিতর দিয়া এইরূপ আলো সহজেই চলিয়া যায়। কিন্তু জলের গেলাস সম্মুখে ধরিলে অদৃশ্য আলো একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্! তদপেক্ষাও আশ্চর্যের বিষয় আছে। ইট-পাটকেল, যাহা অস্বচ্ছ বলিয়া মনে করিতাম তাহা অদৃশ্য আলোকের পক্ষে স্বচ্ছ। আর আলকাতরা? ইহা জানালার কাচ অপেক্ষাও স্বচ্ছ! কোথায় এক অদ্ভুত দেশের কথা পড়িয়াছিলাম ; সে দেশে জলাশয় হইতে মৎস্যেরা ডাঙায় ছিপ ফেলিয়া মানুষ শিকার করে। অদৃশ্য আলোকের কার্যও যেন অনেকটা সেইরূপই অদ্ভুত হইবে।

কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। দৃশ্য আলোকেও এরূপ আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়াছি ; তাহাতে অভ্যস্ত বলিয়া বিস্মিত হই না। সম্মুখের সাদা কাগজের উপর দুইটি বিভিন্ন আলো-রেখা পতিত হইয়াছে ; একটি লাল আর একটি সবুজ। মাঝখানে জনালার কাচ ধরিলে উভয় আলোই অবাধে ভেদ করিয়া যায়। এবার মাঝখানে লাল কাচ ধরিলাম ; লাল আলো অবাধে যাইতেছে, কিন্তু সবুজ কাচ ধরিলে সবুজ আলো বাধা পাইবে না ; কিন্তু লাল আলো বন্ধ হইবে। ইহার কারণ এই যে, ১, সব আলো এক বর্ণের নহে ; ২, কোনো পদার্থ এক আলোর পক্ষে স্বচ্ছ হইতে পারে, কিন্তু অন্য আলোয় পক্ষে অস্বচ্ছ। যদি বর্ণজ্ঞান না থাকিত তাহা হইলেও একই পদার্থের ভিতর দিয়া এক আলো যাইতেছে এবং অন্য আলো যাইতেছে না দেখিয়া নিশ্চয়রূপে বলিতে পারিতাম যে, দুইটি আলো বিভিন্ন বর্ণের। আলকাতরা দৃশ্য আলোর পক্ষে অস্বচ্ছ এবং অদৃশ্য আলোর পক্ষে স্বচ্ছ, ইহা জানিয়া অদৃশ্য আলোক যে অন্য বর্ণের তাহা প্রমাণিত হয়। আমাদের দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হইলে ইন্দ্রধনু অপেক্ষাও কল্পনাতীত অনেক নূতন বর্ণের অস্তিত্ব দেখিতে পাইতাম। তাহাতেও কি আমাদের বর্ণের তৃষ্ণা মিটিত?

মৃত্তিকা-বর্তুল ও কাঁচ-বর্তুল

পূর্বে বলিয়াছি যে, আলো এক স্বচ্ছ বস্তু হইতে অন্য স্বচ্ছ বস্তুর উপর পতিত হইলে বক্রীভূত হয়। ত্রিকোণ

কাচ কিংবা ত্রিকোণ ইষ্টকখণ্ড দ্বারা দৃশ্য আলো যে একই নিয়মের অধীন, তাহা প্রমাণ করা যায়। কাচ-বর্তুল সাহায্যে দৃশ্য আলোক যেরূপ বহুদূরে অক্ষীণভাবে প্রেরণ করা যাইতে পারে, অদৃশ্য আলোকও সেইরূপে প্রেরণ করা যায়। তবে এজন্য বহুমূল্য কাচ-বর্তুল নিস্প্রয়োজন, ইট-পাটকেল দিয়াও এইরূপ বর্তুল নির্মিত হইতে পারে। প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখে যে ইষ্টকনির্মিত গোল স্তম্ভ আছে তাহা দিয়া অদৃশ্য আলো দূরে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। দৃশ্য আলো সংহত করিবার পক্ষে হীরক-খণ্ডের অদ্ভুত ক্ষমতা। বস্তুবিশেষের আলো সংহত করিবার ক্ষমতা যেরূপ অধিক, আলো বিকিরণ করিবার ক্ষমতাও সেই পরিমাণে বহুল হইয়া থাকে। এই কারণেই হীরকের এত মূল্য। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চীনা-বাসনের অদৃশ্য আলোক সংহত করিবার ক্ষমতা হীরক অপেক্ষাও অনেকগুণ অধিক। সুতরাং যদি কোনোদিন আমাদের দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হইয়া রক্তিম বর্ণের সীমা পার হয় তবে হীরক তুচ্ছ হইবে এবং চীনা-বাসনের মূল্য অসম্ভবরূপে বাড়িবে। প্রথমবার বিলাত যাইবার সময় অভ্যস্ত কুসংস্কার হেতু চীনাবাসন স্পর্শ করিতে ঘৃণা হইত। বিলাতে সম্ভ্রান্ত ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া দেখিলাম যে, দেওয়ালে বহুবিধ চীনা-বাসন সাজানো রহিয়াছে। ইহার এমন কি মূল্য যে, এত যত্ন? প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, এখন বুঝিয়াছি ইংরেজ ব্যবসাদার। অদৃশ্য আলো দৃশ্য হইলে চীনা-বাসন অমূল্য হইয়া যাইবে। তখন তাহার তুলনায় হীরক কোথায় লাগে! সেদিন শৌখিন রমণী-গণ হীরকমালা প্রত্যাখ্যান করিয়া পেয়ালা-পিরিচের মালা সগর্বে পরিধান করিবেন এবং অচীনধারিণী নারীদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবেন!

সর্বমুখী এবং একমুখী আলো

প্রদীপের অথবা সূর্যের আলো সর্বমুখী; অর্থাৎ স্পন্দন একবার ঊর্ধ্বাধঃ অন্যবার দক্ষিণে বামে হইয়া থাকে। লঙ্কাদ্বীপের টুর্মালিন স্ফটিকের ভিতর দিয়া আলো প্রেরণ করিলে আলো একমুখী হইয়া যায়। দুইখানি টুর্মালিন সমান্তরালভাবে ধরিলে আলো দুইয়ের ভিতর দিয়া ভেদ করিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু একখানি অন্যখানির উপর আড়ভাবে ধরিলে আলো উভয়ের ভিতর দিয়া যাইতে পারে না।

অদৃশ্য আলোকও এইরূপে একমুখী করা যাইতে পারে। কিরূপে তাহা হয় বুঝাইতে হইলে নীতি-কথার বক ও শৃগালের গল্প স্মরণ করা আবশ্যক। বক শৃগালকে নিমন্ত্রণ করিয়া পানীয় দ্রব্য গ্রহণ করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিল। লম্বা বোতলে পানীয় দ্রব্য রক্ষিত ছিল। বক লম্বা ঠোঁট দিয়া অনায়াসে পান করিল; কিন্তু শৃগাল কেবলমাত্র সৃক্কনী লেহন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পরের দিন শৃগাল ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিল। পানীয় দ্রব্য থালাতে দেওয়া হইয়াছিল। বক ঠোঁট কাৎ করিয়াও কোনো প্রকারেই পানীয় শোষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। বোতল ও থালার দ্বারা যেরূপ লম্বা ঠোঁট এবং চেপ্‌টা মুখের বিভিন্নতা বুঝা যায়, সেইরূপ একমুখী আলোকের পার্থক্য ধরা যাইতে পারে, তাহা লম্বা কিংবা চেপ্‌টা—ঊর্ধ্বাধঃ অথবা এ-পাশ ও-পাশ।

বক-কচ্ছপ সংবাদ

মনে কর, দুই দল জন্তু মাঠে চরিতেছে—লম্বা জানোয়ার বক ও চেপ্‌টা জীব কচ্ছপ। সর্বমুখী অদৃশ্য আলোকও এইরূপ দুই প্রকারের স্পন্দনসঞ্জাত। দুই প্রকারের জীব-দিগকে বাছিবার সহজ উপায়, সম্মুখে লোহার গরাদ খাড়া-ভাবে রাখিয়া দেওয়া। জন্তুদিগকে তাড়া করিলে লম্বা বক সহজেই পার হইয়া যাইবে; কিন্তু চেপ্‌টা কচ্ছপ গরাদের এ-পাশে থাকিবে। প্রথম বাধা পার হইবার পর বকবৃন্দের সম্মুখে যদি দ্বিতীয় গরাদ সমান্তরালভাবে ধরা যায়, তাহা হইলেও বক তাহা দিয়া গলিয়া যাইবে। কিন্তু দ্বিতীয় গরাদখানাকে যদি আড়ভাবে ধরা যায়, তাহা হইলে বক আটকাইয়া থাকিবে। এইরূপে একটি গরাদ অদৃশ্য আলোর সম্মুখে ধরিলে আলো একমুখী হইবে। দ্বিতীয় গরাদ সমান্তরালভাবে ধরিলে আলো উহার ভিতর দিয়াও যাইবে, তখন দ্বিতীয় গরাদটা আলোর পক্ষে স্বচ্ছ হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় গরাদটা আড়ভাবে ধরিলে আলো যাইতে পারিবে না, তখন গরাদটা অস্বচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। যদি আলো একমুখী হয় তাহা হইলে কোনো কোনো বস্তু একভাবে ধরিলে অস্বচ্ছ হইবে; কিন্তু ৯০ ডিগ্রি ঘুরাইয়া ধরিলে তাহার ভিতর দিয়া আলো যাইতে পারিবে।

পুস্তকের পাতাগুলি গরাদের মতো সজ্জিত। বিলাতে রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউসনে বক্তৃতা করিবার সময় টেবিলের উপর একখানা রেলের টাইম-টেব্‌ল্, অর্থাৎ ব্রাড্‌শ ছিল, তাহাতে 10 হাজার ট্রেনের সময়, রেল-ভাড়া এবং অন্যান্য বিষয় ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত ছিল। উহা এরূপ জটিল যে, কাহারও সাধ্য নাই ইহা হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় বাহির করিতে পারে। আমি পুস্তকের তমসাচ্ছন্নতা কিছু না মনে করিয়া পরীক্ষার সময় দেখাইয়াছিলাম যে, বইখানাকে

এরূপ করিয়া ধরিলে ইহার ভিতর দিয়া আলো যাইতে পারে না ; কিন্তু ৯০ ডিগ্রি ঘুরাইয়া ধরিলে পুস্তকখানা একেবারে স্বচ্ছ হইয়া যায়। পরীক্ষা দেখাইবমাত্র হাসির রোলে হল্ প্রতিধ্বনিত হইল। প্রথম প্রথম রহস্য বুঝিতে পারি নাই। পরে বুঝিয়াছিলাম। লর্ড রেলী আসিয়া বলিলেন যে, ব্রাড্‌শর ভিতর দিয়া এ পর্যন্ত কেহ আলোক দেখিতে পায় নাই। কি করিয়া ধরিলে আলো দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা শিখাইলে জগৎবাসী আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিবে। আমার বৈজ্ঞানিক লেখা পড়িয়া কেহ কেহ স্তম্ভিত হইবেন, দন্তস্ফুট অথবা চক্ষুস্ফুট করিতে সমর্থ হইবেন না। তাহা হইলে বইখানাকে ৯০ ডিগ্রি ঘুরাইয়া ধরিলেই সব তথ্য একবারে বিশদ হইবে।

আলো একমুখী করিবার অন্য এক উপায় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যদিও এলোমেলোভাবে আকাশ-স্পন্দন রমণীর কেশগুচ্ছে প্রবেশ করে, তথাপি বাহির হইবার সময় একবারে শৃঙ্খলিত হইয়া থাকে। বিলাতের নরসুন্দরদের দোকান হইতে বহু জাতির কেশগুচ্ছ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে ফরাসী মহিলার নিবিড় কৃষ্ণকুন্তল বিশেষ কার্যকরী। এ বিষয়ে জার্মান মহিলার স্বর্ণাভ কুন্তল অনেকাংশে হীন। প্যারিসে যখন এই পরীক্ষা দেখাই তখন সমবেত ফরাসী পণ্ডিত-মণ্ডলী এই নূতন তত্ত্ব দেখিয়া উল্লসিত হইয়াছিলেন। ইহাতে বৈরী জাতির উপর তাহাদের প্রাধান্য প্রমাণিত হইয়াছে, ইহায় কোনো সন্দেহই রহিল না। বলা বাহুল্য, বার্লিনে এই পরীক্ষা প্রদর্শনে বিরত হইয়াছিলাম।

যে সব পরীক্ষা বর্ণনা করিলাম তাহা হইতে দেখা যায় যে, দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রস্তুতি একই আমাদের দৃষ্টি-শক্তির অসম্পূর্ণতা হেতু উহাদিগকে বিভিন্ন বলিয়া মনে করি।

তারহীন সংবাদ

অদৃশ্য আলোক ইট পাটকেল, ঘর-বাড়ি ভেদ করিয়া অনায়াসেই চলিয়া যায়। সুতরাং ইহার সাহায্যে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে। 1895 সালে কলিকাতা টাউন হলে এ সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। বাংলার লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্নর স্যার উইলিয়াম ম্যাকেঞ্জি উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুৎ-ঊর্মি তাঁহার বিশাল দেহ এবং আরও দুইটি রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিয়া তৃতীয় কক্ষে নানাপ্রকার তোলপাড় করিয়াছিল। একটা লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আওয়াজ করিল এবং বারুদস্তূপ উড়াইয়া দিল। 1907 সালে মার্কনি তারহীন সংবাদ প্রেরণ করিবার পেটেন্ট গ্রহণ করেন। তাঁহার অত্যদ্ভুত অধ্যবসায় ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক উন্নতি সাধনে কৃতিত্বের দ্বারা পৃথিবীতে এক নূতন যুগ প্রবর্তিত হইয়াছে। পৃথিবীর ব্যবধান একেবারে ঘুচিয়াছে। পূর্বে দূর দেশে কেবল টেলিগ্রাফের সংবাদ প্রেরিত হইত, এখন বিনা তারে সর্বত্র সংবাদ পৌঁছিয়া থাকে।

কেবল তাহাই নহে। মনুষ্যের কণ্ঠস্বরও বিনা তারে আকাশতরঙ্গ সাহায্যে সুদূরে শ্রুত হইতেছে। সেই স্বর সকলে শুনিতে পায় না, শুনিতে হইলে কর্ণ আকাশের সুরের সহিত মিলাইয়া লইতে হয়। এইরূপে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অহোরাত্রি কথাবার্তা চলিতেছে। কান পাতিয়া তবে একবার শোনো। 'কোথা হইতে খবর পাঠাইতেছ ?' উত্তর—'সমুদ্র-গর্ভে, তিন শত হাত নীচে ডুবিয়া আছি। টর্পেডো দিয়া তিনখানা রণতরী ডুবাইয়াছি, আর দুইখানার প্রতীক্ষায় আছি।' আবার এ কি ঃ একেবারে লক্ষ লক্ষ কামানের গর্জন শোনা যাইতেছে, অগ্ন্যুৎপাতে যেন মেদিনী বিদীর্ণ হইল। পরে জানিলাম মহাসাম্রাজ্য চূর্ণ হইয়াছে, কল্য হইতে পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরকম হইবে। এই ভীষণ নিনাদের মধ্যেও মনুষ্য-কণ্ঠের কত মর্মবেদনাধ্বনি, কত মিনতি, কত জিজ্ঞাসা ও কত রকমের উত্তর শোনা যায়। ইহার মধ্যে কে একজন অবুঝের মতো বার বার একই নাম ধরিয়া ডাকিতেছে—'কোথায় তুমি—কোথায় তুমি ?' কোনো উত্তর আসিল না—সে আর এই পৃথিবীতে নাই।

এইরূপ দূরদূরান্ত বাহিয়া আকাশের সুর ধ্বনিত হইতেছে। মনে কর, কোনো অদৃশ্য অঙ্গুলি বৈদ্যুতিক অর্গানের বিবিধ স্টপ আঘাত করিতেছে। বাম দিকের স্টপে আঘাত করাতে এক সেকেণ্ডে একটি স্পন্দন হইল। অমনি শূন্যমার্গে বিদ্যুৎ-ঊর্মি ধাবিত হইল। কি প্রকাণ্ড সেই সহস্র ক্রোশব্যাপী ঢেউ! উহা অনায়াসে হিমাচল উল্লঙ্ঘন করিয়া এক সেকেণ্ডে পৃথিবী দশবার প্রদক্ষিণ করিল। এবার অদৃশ্য অঙ্গুলি দ্বিতীয় স্টপ আঘাত করিল। এইবার প্রতি সেকেণ্ডে আকাশ দশবার স্পন্দিত হইল। এইরূপে আকাশের সুর ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতরে উঠিবে ; স্পন্দনসংখ্যা এক হইতে দশ, শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি গুণ বৃদ্ধি পাইবে। আকাশ-সাগরে নিমজ্জমান রহিয়া আমরা অগণিত ঊর্মি দ্বারা আহত হইব, কিন্তু ইহাতেও কোনো ইন্দ্রিয় জাগরিত হইবে না। আকাশ-স্পন্দন আরও ঊর্ধ্বে উঠুক তখন কিয়ৎক্ষণের জন্য তাপ অনুভূত হইবে। তাহার পর চক্ষু উত্তেজিত হইয়া রক্তিম,

পীতাদি আলোক দেখিতে পাইবে। এই দৃশ্য আলোক এক সপ্তক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। সুর আরও উচ্চে উঠিলে দৃষ্টিশক্তি পুনরায় পরাস্ত হইবে, অনুভূতি শক্তি আর জাগিবে না, ক্ষণিক আলোকের পরই অভেদ্য অন্ধকার।

তবে তো আমরা এই অসীমের মধ্যে একেবারে দিশাহারা, কতটুকুই বা দেখিতে পাই? একান্তই অকিঞ্চিৎকর! অসীম জ্যোতির মধ্যে অন্ধবৎ ঘুরিতেছি এবং ভগ্ন দিক্-শলাকা লইয়া পাহাড় লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। হে অনন্ত পথের যাত্রী, কি সম্বল তোমার?

সম্বল কিছুই নাই, আছে কেবল অন্ধ বিশ্বাস; যে বিশ্বাস-বলে প্রবাল সমুদ্রগর্ভে দেহাস্থি দিয়া মহাদ্বীপ রচনা করিতেছে। জ্ঞান-সাম্রাজ্য এইরূপ অস্থিপাতে তিল তিল করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। আঁধার লইয়া আরম্ভ, আঁধারেই শেষ, মাঝে দুই একটি ক্ষীণ আলো-রেখা দেখা যাইতেছে। মানুষের অধ্যবসায়-বলে ঘন কুয়াশা অপসারিত হইবে এবং একদিন বিশ্বজগৎ জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিবে।

[১৩৩২ ভাদ্র সংখ্যায় 'মোস্‌লেম ভারত' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।]

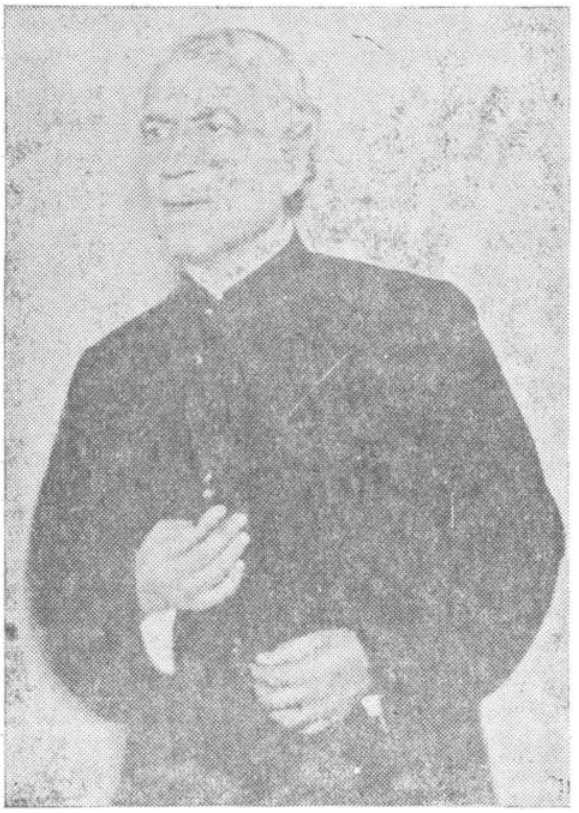

জগদীশচন্দ্রের একটি দুষ্প্রাপ্য আলোক চিত্র

অপ্রকাশিত পত্র

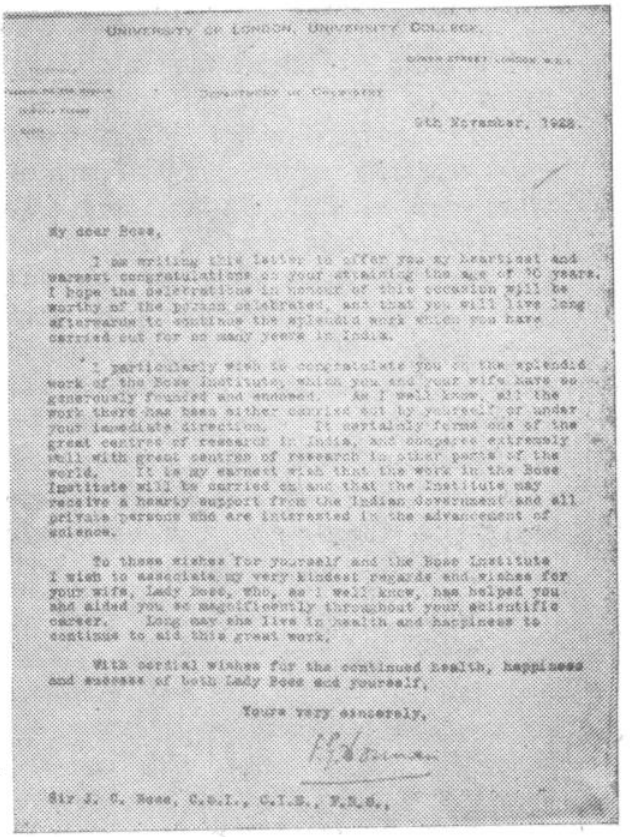

University of London, University College.

5th November, 1928.

My dear Bose,

I am writing this letter to offer you my heartiest and warmest congratulations on your attaining the age of 70 years. I hope the celebrations in honour of this occasion will be worthy of the great celebrated, and that you will live long afterwards to continue the splendid work which you have carried out for so many years in India.

I particularly wish to congratulate you on the splendid work of the Bose Institute, which you and your wife have so generously founded and endowed. As I well know, all the work there has been either carried out by yourself or under your immediate direction. It certainly forms one of the great centres of research in India, and compares extremely well with great centres of research in other parts of the world. It is my earnest wish that the work in the Bose Institute will be carried on and that the Institute may receive a hearty support from the Indian Government and all private persons who are interested in the advancement of science.

To these wishes for yourself and the Bose Institute I wish to associate my very kindest regards and wishes for your wife, Lady Bose, who, as I well know, has helped you and aided you so magnificently throughout your scientific career. Long may she live in health and happiness to continue to aid this great work.

With cordial wishes for the continued health, happiness and success of both Lady Bose and yourself,

Yours very sincerely,

Sir J. C. Bose, C.S.I., C.I.E., F.R.S.,

আচার্য জগদীশচন্দ্রের ৭০তম জন্ম-জয়ন্তীতে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডোনানের পত্র

ট্রপিক্যাল মেডিসিন কংগ্রেসের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বহু বৈজ্ঞানিকের সমক্ষে

আচার্য জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা

স্থান—বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বক্তৃতা কক্ষ

তারিখ—6ই ডিসেম্বর 1927 সাল।

(7ই ডিসেম্বর 1927 তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত)

সর্বপ্রকার প্রানক্রিয়ার সমক্রিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে আমি আমার অনুসন্ধান আরম্ভ করি। যদি এই সমক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা যায়। তবে বিজ্ঞান রাজ্যে একটা বিরাট রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন হইবে, জীব দেহের যে সমস্ত জটিল সমস্যা আমরা সমাধান করিতে সমর্থ হইনা, উদ্ভিদ দেহের অনুরূপ ক্রিয়া দেখিয়া সে সমস্ত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হইবে। উদ্ভিদ ও জীবের প্রাণের সমক্রিয়া কি করিয়া প্রতিপন্ন করা যায়? নিছক কল্পনা যতই আনন্দদায়ক হউক না কেন, তাহাতে কোন ফল হইবে না। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কঠোর পথে অনুসরণ করিতে হয়। নানাপ্রকার কৌশলে মূক উদ্ভিদকে দিয়াই স্বয়ং প্রান ক্রিয়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অবয়ব ও অবয়বের কার্য

প্রাণীদেহের প্রত্যেকটি অবয়ব সমগ্র দেহের এক একটি বিশেষ কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীর পাকযন্ত্রের কার্য তুলনা এই কথাটি স্পস্টতররূপে বুঝিতে পারা যাইবে। পাকযন্ত্রের কার্য হইতেছে পাকেরস নিঃসরণ দ্বারা ভুক্তদ্রব্যকে দ্রবীভূত করিয়া হজম করা। Sundew নামক কীটভুক উদ্ভিদের পত্রগুলির মধ্যে কতক-গুলি শুঁয়া থাকে, সেই শুঁয়াগুলি এক-প্রকার টক রস নিঃসরণ করে। এই রসের মধ্যে কীটপতঙ্গ আটক পড়িয়া যায়। পরে কীটপতঙ্গ যখন ছাড়া পাইবার জন্য হস্তাদি বিক্ষেপ আরম্ভ করে, তখন অন্যান্য শুঁয়াগুলি শিকারকে আরও শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকে। অতঃপর কীটগুলি দ্রবীভূত হইয়া যায়, শুধু কঙ্কালগুলি অবশিষ্ট থাকে। সম্পূর্ণ উন্মুক্ত পাকস্থলীর কার্যের নিদর্শন এই ক্ষেত্রে দেখা গেল; কিন্তু প্রাণীদেহের অভ্যন্তরস্থ পাকস্থলীর কার্য এত সহজ নহে। যাহা হউক, পচনক্রিয়ার ক্ষমতা দেখিয়া, ডারুইনের অনুসন্ধান লব্ধ তথ্য প্রকাশের পর সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে কীটভুক উদ্ভিদের পাকস্থলী আছে। Venus নামক গাছের পাতার দুইটি অর্দ্ধাংশ মিলিয়া একটি ফাঁদের আকার ধারণ করে, ঠিক যেন বৃক্ষটি মুখ-ব্যাদান করিয়া থাকে। যেই কোন কীট এই ফাঁদে পড়ে, অমনি পাতাটি বুজিয়া যায়। Nepenthe র পাকযন্ত্র একটি থলিয়ার আকৃতি। ইহার পাকযন্ত্র কতকটা প্রাণী-দেহের পাকযন্ত্রের অনুরূপ। এইরূপ যদি উদ্ভিদ জীবনে অনুসন্ধান করা যায় তবে দেখা যায় যে, সরল সহজ যন্ত্র কি ভাবে ধীরে ধীরে জটিল যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

প্রাণীদেহে তিন প্রকার কোষ আছে—পেশীকোষ, স্নায়ুকোষ এবং স্বতঃস্পন্দনশীল কোষ। উদ্ভিদদেহেও অনুরূপ ক্রিয়াশীল কোন কোষ আছে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। আমি পূর্বে বক্তৃতা প্রসঙ্গে উদ্ভিদের নাড়ীর সঙ্কোচন প্রসারণ কার্য দেখাইয়াছি, এক্ষণে শুধু রস সঞ্চালন ক্রিয়া দেখাইলেই চলিবে। প্রাণীদেহে কতগুলি কোষ আছে, যাহাদের স্বতঃসঙ্কোচন বিস্ফোরণের দ্বারা এই কার্য হইয়া থাকে। উদ্ভিদদেহে এরূপ কোষ স্বতঃসঙ্কোচনে বিস্ফোরণশীল কোষ আছে কিনা?

একটি সঙ্কোচন প্রসারণশীল যন্ত্রের সাহায্যে প্রাণী দেহের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। সেই যন্ত্রটির নাম হৃদযন্ত্র। কোচা প্রভৃতি নিম্নস্তরের প্রাণীদেহে হৃদয়যন্ত্রটি একটি লম্বমান নলাকৃতি, এই হৃদযন্ত্রের সঙ্কোচন বিস্ফারণের সহায়ে সঞ্জীবনী রস সঞ্চালিত হয়। উচ্চতর স্তরের প্রাণীর মধ্যেও হৃদয়যন্ত্রটি লম্বাকৃতি। প্রাণীদেহের হৃদযন্ত্রস্থিত কোষগুলির বৈশিষ্ট স্বতঃস্পন্দন-শীলতা, বিভিন্ন অবস্থায় এই স্পন্দনের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। কোন কোন উত্তেজক ঔষধির ফলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া দ্রুত সম্পাদিত হইতে থাকে, ফলে দ্রুত রক্ত সঞ্চালিত হয়। আবার অবসাদজনক ঔষধির ফলে ঠিক বিপরীত ভাব দেখা যায়।

রক্ত সঞ্চালন কার্যে প্রত্যক্ষীকরণ

একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমি একটি ভেকের রক্ত সঞ্চালন কার্য এই যবনিকার উপর প্রতিফলিত করিতেছি। দেখুন প্রধান শিরা এবং উপশিরার মধ্য দিয়া কিরূপ দ্রুতগতিতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে। আমি এক্ষণে একটি অবসাদজনক ঔষধি প্রয়োগ করিতেছি। দেখুন ঠিক বিপরীত ক্রিয়া দেখা যাইতেছে, এই দেখুন রক্ত প্রবাহ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, উদ্ভিদ দেহের রস সঞ্চালন অনুরূপ হৃদ ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন হয় কি না? প্রচলিত সিদ্ধান্ত এই যে, উদ্ভিদ্ দেহে রস সঞ্চালন জড় ক্রিয়ার ফল—জীবন্ত কোষের প্রাণক্রিয়ার ফলে নহে। ইউক্যালি পটাস বৃক্ষে ৪৫০ ফুট পর্যন্ত উর্দ্ধে রস সঞ্চালিত হয়। কোন জড় যন্ত্রের সাহায্যে এত উচ্চে জল উত্তোলন করা অসম্ভব। প্রাণক্রিয়া দ্বারাই এই কার্য হয় কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য হ্রাস্ বার্গার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধান অসম্পূর্ণ থাকার ফলে এই প্রাণক্রিয়া সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অনেকটা খর্ব হইয়া পড়ে। হ্রাস্ বার্গার পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে বিষ প্রয়োগ দ্বারা উদ্ভিদ দেহে রস সঞ্চালন হ্রাস পায় না। ইহা হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, যদি উদ্ভিদের দেহে রস সঞ্চালন কার্য জীবিত কোষের সাহায্যেই হত, তবে বিষক্রিয়ার ফলে কোষগুলির নিশ্চয় মৃত্যু হইত এবং রস সঞ্চালন বন্ধ হইত। অন্যান্য অনেকে অন্ধভাবে এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। একটু বাদেই আমি আপনাদিগকে যাহা দেখাইব তাহাতে হ্রাস বার্গারের সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তাহা প্রমানিত হইবে। পক্ষান্তরে আমি প্রমাণ করিব যে, জীবন্ত কোষের স্পন্দনশীলতার ফলেই রস সঞ্চালন অব্যাহত থাকে।

উদ্ভিদ্ দেহে কিভাবে রস সঞ্চালিত হয়, আমি এক্ষণে দেখাইতেছি। আমি আরো দেখাইব যে, যে অবস্থায় প্রাণীদেহে রক্ত সঞ্চালনের হ্রাস, বৃদ্ধি হয়, সে অবস্থায় উদ্ভিদদেহে রস সঞ্চালনেরও হ্রাস বৃদ্ধি হয়। রস সঞ্চালনের বেগ পরিমাপক কোন সন্তোষজনক উপায় ইতিপূর্বে উদ্ভাবিত হয় নাই। রস সঞ্চালনের বেগ নির্ণয় করিবার জন্য আমি একটি উপায় বাহির করিয়াছি। এই উপায়ে উদ্ভিদের পত্রগুলিকেই মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করা যায়। জলাভাবে পাতাগুলি হেলিয়া পড়ে, আবার জল পাইলে পাতাগুলি সোজা হইয়া উঠে, অধিকন্তু কোন উপায়ে যদি রস সঞ্চালন বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে পাতাগুলি দ্রুত সোজা হইয়া উঠে। আবার অবসাদ জন্মাইয়া রস সঞ্চালন হ্রাস করিলে পাতাগুলি হেলিয়া পড়ে। পাতাগুলির এই উত্থান পতনের হার এত সামান্য যে চক্ষে ধরা সম্ভব নহে, যন্ত্র সাহায্যে এই হারকে বৃহদাকারে প্রতিফলিত করা সম্ভব,—আমি তাহাই দেখাইতেছি। এই যে গাছটি দেখিতেছেন, ইহা জলশূন্য স্থানে ছিল, কাজেই পাতাগুলি হেলিয়া পড়িয়াছে। আমি এক্ষণে গাছটিতে জল সিঞ্চন করিতেছি। দেখুন পাতাগুলি সোজা হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই পাতাগুলি ঠিক এক চোটে সোজা হইয়া উঠিতেছে না। কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিতেছে। ইহা দ্বারাই অদৃশ্য সঙ্কোচন প্রসারণশীল যন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমানিত হইতেছে। আমি এক্ষণে পটাশিয়াম ব্রমাইড নামক অবসাদজনক ঔষধি প্রয়োগ করিতেছি। দেখুন জলসিঞ্চনের ফলে পত্রগুলি যে ভাবে সোজা হইয়া দাঁড়াইতেছিল এক্ষণে আর সে ভাব নাই। পাতাগুলি এক্ষণে আবার কাঁপিতে কাঁপিতে হেলিয়া পড়িতেছে।

প্রাণীদেহে কর্পূর প্রয়োগের ফলে হৃদ ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। আমি সামান্য কর্পূর মিশ্রিত জল এই গাছটিতে দিতেছি। দেখুন দুইটি পরস্পর বিরোধী ক্রিয়ার কি সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। এই দেখুন শেষ কালে উত্তেজক ঔষধির কার্যই জয় লাভ করিল—প্রতিচালিত আলোক রেখা উর্দ্ধগমন করিয়া রস সঞ্চালনের বৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে।* আমি এক্ষণে গাছটিকে তড়িতাঘাত করিতেছি। দেখুন তড়িতাঘাতে আমাদের দেহ যেরূপ বিক্ষেপের সঞ্চার হয়, গাছটিতেও সেরূপ বিক্ষেপের সঞ্চার হইল।

এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, গাছটির মধ্যে নিশ্চয়ই আকর্ষণ বিকর্ষণ কোষ আছে। যে যন্ত্রের সাহায্যে কোষগুলির এই সঙ্কোচন প্রসারণ হয়, তাহার অবস্থিতি কোথায়? আমি আমার বৈদ্যুতিক শলাকা** (Electric probe) সহায়ে অবস্থিতির স্থান নির্ণয় করিয়াছি। আমি ধীরে ধীরে বৈদ্যুতিক শলাকাটি গাছটির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেখিয়াছি। তারপর যবনিকার উপর প্রতিফলিত আলোকরেখাটি একবার দক্ষিণে, আর একবার বামে দুলিয়া হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার আশ্চর্য জনক পরিচয় দিয়াছি…।

* জগদীশচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত Optical sphygmograph যন্ত্রে এই পরীক্ষা দেখিয়েছিলেন।

** উদ্ভিদের বিদ্যুৎ সক্রিয় স্তর খুঁজে পাওয়ার যন্ত্র।

বাঙ্গালী মহিলার পৃথিবী ভ্রমণ

অবলা বসু

"ছেলেবেলা হইতেই ইচ্ছা ছিল, আমার এই সামান্য জীবন যেন দেশসেবায় নিয়োগ করিতে পারি। এই আকাঙ্খা চরিতার্থ করিবার কোন গুণই আমার ছিল না। কিন্তু দেবতার আশীর্বাদে আমার কল্পনার অতীত সার্থকতা জীবনে লাভ করিয়াছি। বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া দেশ-সেবার নানা উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। সে কথা বলিতে গেলে 1896 খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিতে হয়। সেই বৎসর আচার্য বসু মহাশয় অদৃশ্য-আলোক সম্বন্ধে তাঁহার নূতন আবিষ্ক্রিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রদর্শন করিবার জন্য ব্রিটিশ এসোসিয়েশনে আহুত হন। তাঁহার সহিত আমিও যাই; এই আমার প্রথম ইয়োরোপ যাত্রা। ইহার পর 5/6 বার তাঁহার সহিত পৃথিবীব্যাপী ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। আমার ভ্রমণকালের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাস নানাভাবে ভাঙিয়াছে ও গড়িয়াছে, এক আমার বয়সেই ইয়োরোপে কত পরিবর্তন দেখিলাম। এদেশে একটি মানুষের জীবনে এমন বিপুল পরিবর্তন কখনও দেখা যায় না।"

"বিলাতে পৌঁছিয়াই আচার্য লিভারপুলে সমাগত ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের বৈজ্ঞানিক সম্মিলনে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রিত হন। বক্তৃতার দিন হলটি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক দ্বারা পূর্ণ দেখিলাম। তাহার মধ্যে Sir J. J. Thomsen, Oliver Lodge ও লর্ড Kelvin ছিলেন।...ফল কি হইবে ভাবিয়া আশঙ্কায় আমার হৃদয় কাঁপিতেছিল। তারপর যে কি হইল সে সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোন ছবি আজ আর নাই। তবে ঘনঘন করতালি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে পরাভব স্বীকার করিতে হয় নাই বরং জয়ই হইয়াছে। দেখিলাম একজন বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া গ্যালারীতে উঠিয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া আচার্যের আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে বহুবিধ প্রশংসা করিলেন। জানিতে পারিলাম ইনিই অদ্বিতীয়, লর্ড কেলভিন।

ইনি অত্যন্ত আদর করিয়া আমাদিগকে তাঁহার গ্লাসগোর ভবনে নিমন্ত্রণ করিলেন। অলিভার লজ মহাশয়ও নানারূপে আমাদের সম্বর্ধনা করিলেন। তাঁহারা দুজনেই আচার্যকে ইংলণ্ডে থাকিয়া অধ্যাপক হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের হাওয়া ছাড়া তিনি কাজ করিতে অসমর্থ বলিয়া আচার্য তাঁহাদিগকে অসম্মতি জানাইলেন।"

" ইহার পরে লণ্ডনের প্রসিদ্ধ রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের শুক্রবাসরীয় বক্তৃতা দিবার জন্য আচার্য নিমন্ত্রিত হন। এই স্থানে বক্তৃতা দেওয়া অত্যন্ত সম্মানের চিহ্ন। তরল গ্যাসের (Liguid gas) আবিষ্কর্তা প্রসিদ্ধ Sir James Dewar তখন ইহার কর্তা ছিলেন। তিনি রয়্যাল ইনস্টিটিউশন এরই উপরের তলাতে বাস করিতেন। সেদিন আমাদের সান্ধ্য ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া বহু সম্মানিত লোকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। এই প্রথম আমার বৈজ্ঞানিক সামাজিক সম্মিলনে নিমন্ত্রণ, তাহার ফলে অনেকের সহিত বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইলাম। বঙ্গনারীর এই প্রথম বৈজ্ঞানিক জগতে প্রবেশ। সত্য কথা বলিতে কি, পূর্বে আমার ধারণা ছিল যে, বৈজ্ঞানিকদের স্ত্রীরাও সকলেই বুঝি খুব বিদুষী। এই সব নিমন্ত্রণে গিয়া সে ধারণা ক্রমে ক্রমে চলিয়া গেল—"

"...সভাপতির পার্শ্বে আমি বসিলাম, যে স্থানে ডেভি ও ফ্যারাডে বক্তৃতা দিতেন, সেই হলেও সেই টেবিলে যখন এই তরুণ বাঙ্গালী বক্তৃতা দিতে দাঁড়াইলেন তখন আমার জীবন সার্থক মনে হইল। ভারতের জয় পতাকা আবার নূতন করিয়া বিশ্বের সম্মুখে তোলা হইল, মনে করিলাম। অন্যান্য সভার রীতির মতন এই সভাতে বক্তার পরিচয় দেওয়ার রীতি নাই, কারণ এখানে যিনি বক্তৃতা দেন তাঁহাকে সকলেই জানে। সুতরাং ঘড়িতে ৯টা বাজিবামাত্র আচার্য বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। একঘণ্টা নীরবে সকলে বক্তৃতা শুনিলেন এবং বক্তৃতা অন্তে সকলেই আচার্যকে ঘিরিয়া অভিবাদন করিলেন। Lord Raleigh বলিলেন যে এরূপ নির্ভুল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কখনও হয় নাই, দু-একটি ভুল হইলে মনে হইত যেন জিনিসটা বাস্তব; এ যেন মায়াজাল..."

...এই রয়্যাল ইনস্টিটিউশন-এর কার্য পদ্ধতি দেখিয়া তখন হইতেই আমাদের দেশে এরূপ কোন স্থান করিবার বাসনা আমার মনেও উদয় হইল এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সূচনা ও কল্পনা তখন হইতেই আরম্ভ হইল...।"

(*বাংলা 1332 সালের প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশবিশেষ)

আচার্য জগদীশচন্দ্রের যন্ত্র

দিবাকর সেন

সামান্য উপকরণকে কাজে লাগিয়ে সূক্ষ্ম কাজের উপযোগী অথচ সরল যন্ত্র নির্মাণে আচার্য জগদীশচন্দ্র ছিলেন বিরল প্রতিভার অধিকারী। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার শুরুতে সঠিক অর্থে সেখানে কোন প্রয়োগশালার অস্তিত্ব ছিল না। তিনি তাঁর গবেষণা শুরুর কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, What was my equipment and what was my Laboratory? There were practically no instruments, and the extent of my laboratory was a small room about 20ft. Square with an attached bathroom। তা সত্ত্বেও তিনি ছাত্রদের পড়াবার সময় নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ কৌশল ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করতেন। রঞ্জন রশ্মি আবিষ্কারের এক বছরের মধ্যে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে নিজস্ব পদ্ধতিতে সুন্দর একটি 'X ray' যন্ত্র তৈরী করেছিলেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণা জীবনের সময় সীমা দীর্ঘ। এই দীর্ঘ গবেষণা জীবনে তিনি গবেষণার প্রয়োজনে শতাধিক আশ্চর্য যন্ত্র তৈরী করেছিলেন। এই সব যুগান্তকারী যন্ত্রের যন্ত্রীরা ছিলেন মালেক, পুঁটিরাম মোঘলজান, বারিক, জামশেদ ও রজনীকান্তের মত আরো কয়েকজন অল্পশিক্ষিত কারিগর। জগদীশচন্দ্র চিরকালই মানুষের কর্মক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। জীবনে বহুবার বিভিন্ন সময়ে নিজের যন্ত্র তৈরীর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "যে কলের নির্মাণ অন্যান্য সৌভাগ্যবান দেশেও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, সেই কল এদেশের আমাদেরই কারিগর দ্বারা নির্মিত হইয়াছে। ইহার মনন ও গঠন সম্পূর্ণ এদেশীয়।"

নীচে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত যন্ত্রের ধারাবাহিক (১৮৯৫-১৯৩৭) বিবরণ দেওয়া হলো—

1. Complete Microwave apparatus.

2. (a) Spiral Spring Receiver (an improvement up on Branly Lodge coherer)

(b) Point contact on metal Surface.

(c) * Tejometer – First use of Semiconductor crystal Galena as detector.

* Patented March 29, 1904 No 755840 (applied for patent in the U.S.A Sept. 30, 1901)

"This was the 'Electric' detector of E. M. waves visible to ultraviolet radiations. Precursor of crystal diodes and 'transistors' and also one of the earliest Photovoltic cells."

3. The Strain cell (Inorganic models to demonstrate the Similarity of response between the living and non living)

4. Photovoltaic Electrolytic cell as model Eye.

5. Vibration Excitor.

6. Rotating Excitor.

7. The Experimental arrangement for studying the interference of electric reactions in plants.

8. Special Thermal Chamber to raise the temperature of a tissue.

9. Experimental arrangement for the "rheotomic" observations.

10. Experimental arrangement for the determination of Secondary effects of electrical excitation by equal alternating electric Shocks.

11. Radio Dynamical Control of distant qun firing by means of Electric waves.

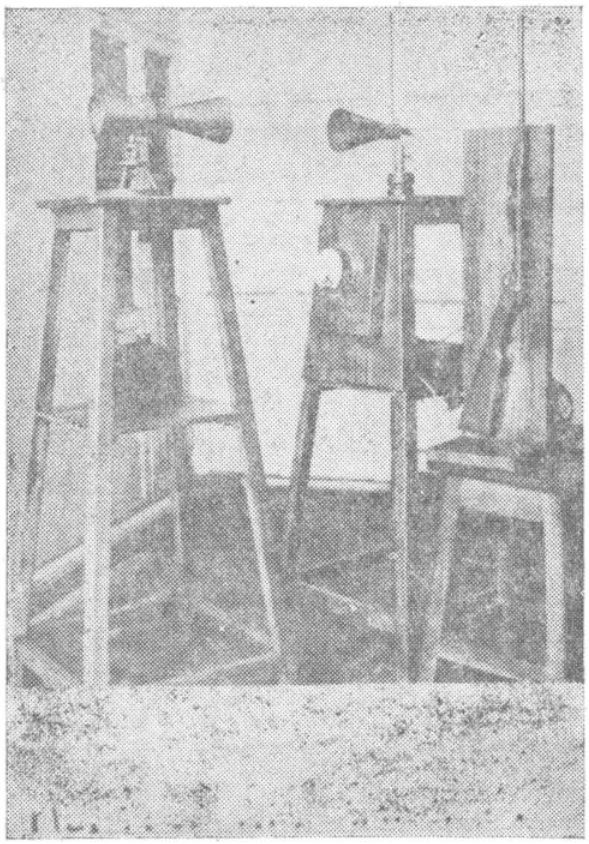

রেডিও ডায়নামিক্যাল কনট্রোল এপারেটাস। এই যন্ত্র দিয়ে (মাইক্রোওয়েভের সাহায্যে) জগদীশচন্দ্র বিনা সংযোগে মার্কনির আগে বার্তা প্রেরণ ও গোলা নিক্ষেপ করেছিলেন।

12. Method of direct effect of excitation by equal alternating shocks.

13. Automatic Recorder of the erectile reaction of stem under Compression.

14. Experimental arrangement for obtaining electric reaction of light.

15. Experimental arrangement for demonstration of the difference of the excitiblity between the ratina and the optic nerve.

16. Pohl Commutator (modified) for closing and opening either the Cathode or the anode.

17. Complete arrangement of the balance for the measurement of conductivity.

18. Experimental arrangement for recording the reactions by variation of resistance.

19. Quadrant Method for the determination of variation of Electric resistance.

20. Experimental arrangement for the study of the variations of conductivity of the nerve by the directive action of an electric current.

21. Complete arrangement for the study of variation of conductivity of mimosa.

22. Experimental arrangement for the electric control of excitation transmitted in plant.

23. Experimental arrangement for geotropic excitation preventing the mechanical reaction of interven.

24. Diametral Method of excitation of an anisotropic Method.

25. Experimental arrangement of instanteneous Shock.

26. Experimental arrangement for showing the reaction of mechanical and electrical reactions.

27. Experimental arrangement of the study of reaction to a mechanical excitation by variation of resistance (adopting whiston bridge principal for studying plant response).

28. Mechanical lever Recorder (myographic).

29. Electric Recorder (Magnetic lever).

30. Response Recorder (Seven types).

31. Stimulation apparatus.
   (a) Spring tapper,
   (b) The torsional vibrator.

32. Optical pulse Recorder.

33. The Spiral Spring Recorder.

34. Hydraulic Model for Explanation of Electric Response.

35. The Kunchangraph.

36. Apparatus for Periodic Stimulations of Plant.

37. The Morograph.

38. Apparatus for detecting Excitatory wave during the transmission in plants.

39. Apparatus for automatic Record of latent period and refractory period of mimosa pudica plant (early type of Resonant Recorder)

40. Apparatus for recording the pulsation of Desmodium gyrans plant (early type of oscillating plate photograph)

41. The Shoshungraph (early type of Sphygmograph)

42. Balanced Shoshungraph.

43. Microscopic optical projection Crescograph.

44. Optical projection Crescograph (Photographic method)

45. Recording Crescograph with balancing arrangement. (Double lever)

46. Portable High magnification Crescograph. (Double lever)

47. Single lever Crescograph.

48. Resonant Recorder.

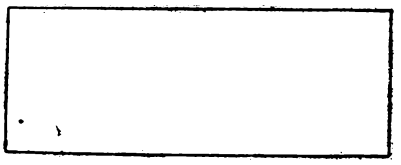

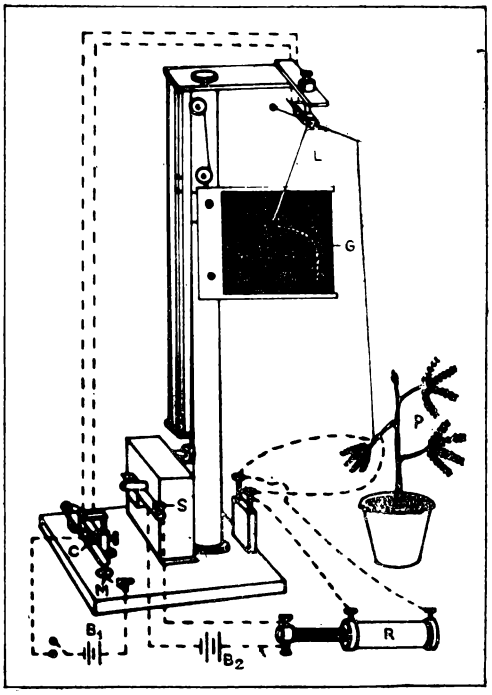

রেজোনাণ্ট রেকর্ডার—স্পর্শকাতর গাছের উত্তেজনার গতিবেগ নিরুপণের যন্ত্র।

49. Magnetic Crescograph.

50. Hydrometric apparatus for recording Contineous variation of rate of growth.

51. Drum recorder for recording direct and indirect stimulation by leaf of Mimosa.

52. Magnetically controlled recorder for Heliotropic response in radial organs in plant.

53. Recording Microscope.

54. Torsion Recorder.

55. Duplex Resonant Recorder.

56. Oscillating recorder for recording Multiple response of the Biophytum plants,

57. Automatic recorder for the Erectile respone of Drooping leaf. (two types)

58. The Electric Probe.

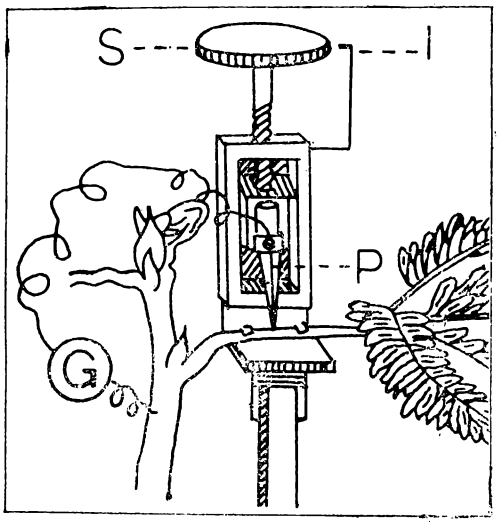

ইলেকট্রিকপ্রোব—উদ্ভিদের বিদ্যুৎ-সক্রিয় স্তর খুঁজে বের করার যন্ত্র।

59. The Potograph.

60. The Micro-Transpirograph.

61. The Differential balance.

62. The Tilter and recorder.

63. Photosynthetic bubbler recorder.

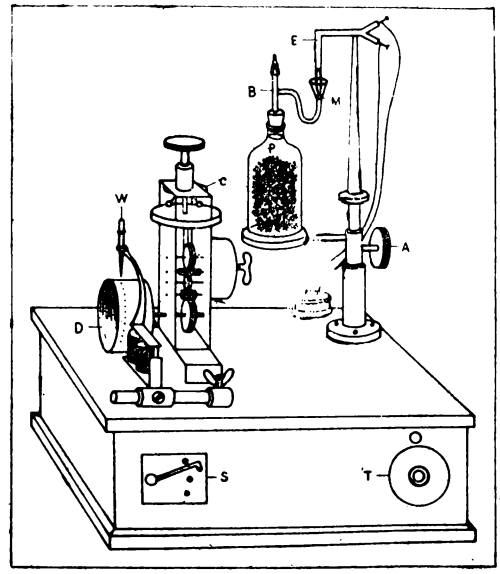

জলজ উদ্ভিদের আলোক সংশ্লেষণ পরিমাপক যন্ত্র।

64. The Photo-electric cell.

65. The Self-recording Radiograph.

66. The portable Electric photometer.

67. The recording arrangemnet of temperature during photosynthesis of green plants.

68. Compact Singular apparatus for recording photosynthetic bubbler with photometer and thermograph.

69. Instrument for recording the photosynthetic activity under different coloured lights by the method of Flotation.

70. The Magnetic Radiometer.

71. The Torsion balance for measurement of increase of weight of the living plant during photosynthesis.

72. Eudiometer.

73. Apparatus for determination of photosynthetic efficiency.

74. Complete apparatus for investigation of the variation of conductivity in Mimosa.

75. Electro thermic Stimulator.

76. Complete apparatus for determination of the diurnal variation of excitability.

77. The Automatic Cell-sphygmograph.

78. Experimental method for obtaining response to mechanical stimulation by resistivity variation.

79. Special balance for recording apparent variation in weight (plant) at death.

80. The Resonant Cardiograph.

81. The Peristaltograph.

82. The High magnification sphygmograph.

83. The root Recorder.

84. The Radio thermal Stimulator

85. The complete Sphygmograph.

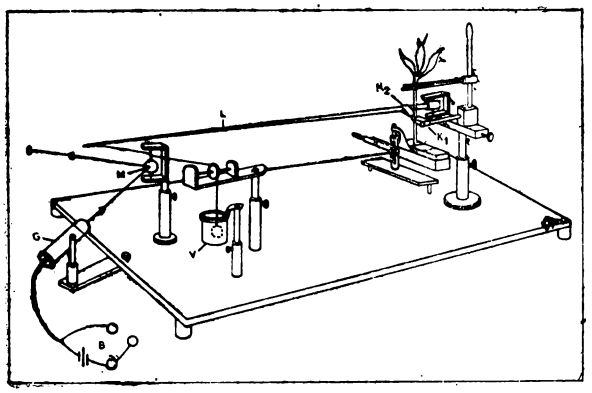

অপটিক্যাল স্ফিগমোগ্রাফ্, উদ্ভিদকাণ্ডের ব্যাসের সূক্ষ্ম পরিবর্তন ও বৃদ্ধি পরিমাপক যন্ত্র।

86. The oscillating plate phytograph (Electrical).

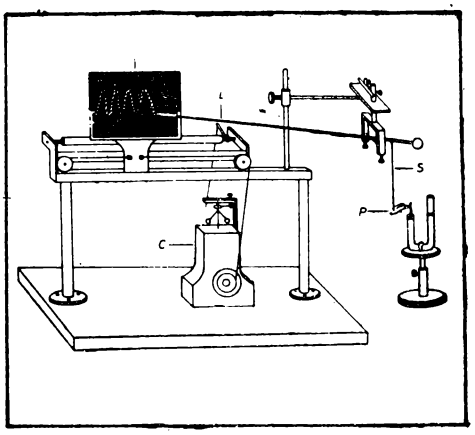

অসিলেটিং প্লেট ফাইটোগ্রাফ। বনচাড়াল গাছের স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ করার যন্ত্র।

87. The Quadruplex diurnal Recorder.

88. The Thermonastic Recorder.

89. Diurnal Recorder for different trees.

90. The phototropic Recorder.

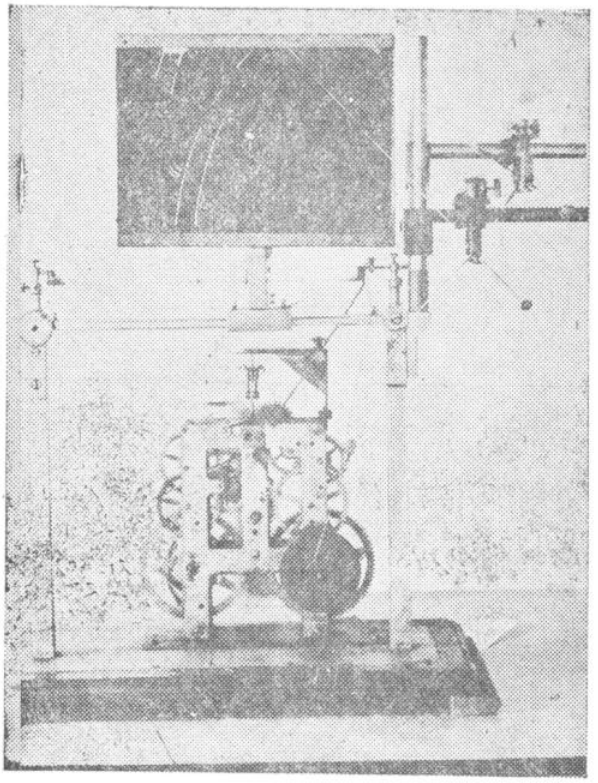

ফটোট্রপিক রেকর্ডার—উদ্ভিদের আলোকানুবর্তিতা পরিমাপক যন্ত্র।

91. The Durnal Indicator.

92. Quadruplex Geotropic Recorder.

93. Optical method of observing rate of torlional movement under unilateral stimulation by gravity.

94 Apparartus for observing modification of electric response under external variation.

95. Complete apparatus for investigation of the variation of conducting power in Mimosa plants.

96. The Oscillating plate phytograph (mechanical).

97. Experimental arrangement for recording axial rotation and vertical rotation of plants.

98. The Nyctitropic Recorder.

99. The Leaf Recorder.

100. The Experimental arrangement of producing Sound-note inside the water without causing any mechanical disturbance.

101. Method of recording opercular pulsation by Resonant Respirograph.

102. Complete apparatus for recording the rate of respiratory activity of the fish.

অনিবার্য কারণবশতঃ বিমান বসুর

'অচেনা আকাশ'

এই সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না।

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা অক্টোবর-নভেম্বর 83 এর দশ বা তার বেশি সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

কলকাতা—

সুজিতকুমার পোদ্দার, বাপী গোস্বামী, প্রণবকুমার সরকার, সুপর্ণা সরকার, রুমকি সরকার, সিদ্ধার্থ নারায়ণ জোয়ারদার, প্রদ্যোৎ কাঞ্জিলাল।

24-পরগণা—

অর্পিতা ব্যানার্জী, কিংশুক মুখার্জী, শংকর প্রসন্ন মুখার্জী, স্মৃতিকণা কর, সৌমেন কর, তমাল ঘটক, অতনু রুদ্র তুহিন ঘটক, পার্থ চক্রবর্তী, মৈত্রেয়ী চক্রবর্ত্তী, রত্না বাগচী।

হাওড়া—

দীপঙ্কর চক্রবর্ত্তী, প্রতিভা সরকার, দুলাল গাঙ্গুলী, অসিতকুমার রীত, তাপসকুমার রীত, দীপঙ্কর ভৌমিক, নিমাই সাউ, কাজল রীত, ইভা রীত, মানসী রীত, শম্পা রীত, অসিত বরণ রীত, পিন্টু রীত, অঞ্জন মুখার্জী,।

হুগলী—

নির্মাল্য মোদক, অশোক বিজয় সরকার, গৌতম কুণ্ডু, শুভেন্দু খাঁ, আলপনা খাঁ, মঞ্জরী কুণ্ডু, দিব্যেন্দু কুণ্ডু, অজয় রায় চৌধুরী, মৌসুমী ঘোষ, আশিষ চ্যাটার্জী, স্বাতী ঘোষ, সুতপা ঘোষ, অমিতাভ ঘোষ, পার্থকুণ্ডু, অসিত কুণ্ডু, ঝর্ণা কুণ্ডু, তাপস দে, সুনীত মিত্র, প্রবীর কুমার ঘোষ।

বর্ধমান—

উপমুন্য ঘোষ, সন্দীপ ঘোষ, অরিন্দম ঘোষ, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, শিবেন্দ্রনাথ রায়, দুর্বা সান্যাল, পার্থ সারথি মুখোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম রায়, মনোমোহন টুডু, রঞ্জিত কিস্কু, তাপস সরকার, রমনা সরকার, নিশার আখতার, চঞ্চল হাজরা, কৌশিক কুণ্ডু সৈয়দ আবদুল ওয়াসিম।

মেদিনীপুর —

শুভজিৎ দেবরায়, কিংশুক হালদার, আশিস মান্না, ঝুমু-মান্না, বীরেন্দ্র নাথ দাস, মধুমিতা সিনহা, এস. কে. রফিক, ইন্দ্রজিৎ স্যানাল, শঙ্করপ্রসাদ অধিকারী, শাশ্বতী অধিকারী, রাজীব রায়, মাণ্ডবী রায়, তপন অধিকারী, পিনকী রায়, শঙ্কর অধিকারী, সেখ রফিক জামান, গোপাল পাঁজা, কাকলী পাঁজা, সুধাংশু ঘোষ।

নদীয়া —

অর্পিতা খাঁ, সুজিত কুমার খাঁ, প্রবীর চক্রবর্ত্তী, শান্তনু চক্রবর্ত্তী, সুধীর চক্রবর্ত্তী শ্যামল বিশ্বাস।

মুর্শিদাবাদ—

চিন্ময় মুখোপাধ্যায়, শুভাশিষ মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ সরকার, সঞ্জীব সরকার, মকবুল হাসান, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়।

বীরভূম—

মতিউর রহমান, আনন্দ রহমান, মন্দিরা ভদ্র, দীপনারায়ণ দত্ত, সুদীপ্তা দত্ত, অমিতাভ চন্দ্র, অণিমা মণ্ডল, বামদেব সরখেল, মুনমুন সরখেল।

বাঁকুড়া—

রবীনকুমার মণ্ডল, স্বপন কুমার মণ্ডল, বাণী মণ্ডল, শ্যাম সুন্দর সাহা।

পুরুলিয়া—

জয়ন্ত কুমার ঘটক, মিণ্টু ঘটক, শেখ মহম্মদ মহসীন, শেখ মহঃ ফারুক।

নলেজ ক্যুইজ

অমরনাথ রায়

1. কোন্ রাজাদের আমলে খাজুরাহোর বিখ্যাত শিব মন্দির নির্মিত হয়েছিল ?
2. সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের নির্দেশে 1981 খৃষ্টাব্দ প্রতিপালিত হয়েছিল কোন বর্ষরূপে ?
3. "স্বরাজ্যে আমার জন্মগত অধিকার আছে এবং এ অধিকার চাই-ই"—এ উক্তি কার ?
4. 'ভবানী মন্দির' গ্রন্থটি কে রচনা করেছিলেন ?
5. মধ্যপ্রদেশের 'কোরবা' কি জন্য বিখ্যাত ?
6. 'সোমনাথ মন্দির' ভারতের কোন্ রাজ্যে অবস্থিত ?
7. পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগর কোন্‌টি ?
8. 'মারডেকা ফুটবল টুর্ণামেণ্ট' শুরু হয় কতো সাল থেকে ?
9. দাবার বোর্ডে কতগুলি বর্গক্ষেত্র আঁকা থাকে ?
10. ইটালীর মুদ্রার নাম কি ?
11. Bio gas-এর প্রধান উপাদান কোন্‌টি ?
12. কপার, জিংক ও লেড ধাতুর মধ্যে কোন্‌টি বেশী নরম ?
13. 'সাগর শশা' প্রাণি না উদ্ভিদ ?
14. 'পিত্ত' কোথা থেকে ক্ষরিত হয় ?
15. বীট, পেঁয়াজ ও পালং শাকের মধ্যে কোন্‌টিতে আয়োডিন থাকে না ?

(সমাধান থাকবে পরবর্তী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার নলেজ ক্যুইজ-এর সমাধান

1. মহম্মদ বিন তুঘলক 2. বোকাচ্চিও 3. হিন্দু কলেজ 4. হোয়াং হো 5. বিহারে 6. ছয়টি 7. 1930 সাল থেকে 8. পেসো 9. পোলো 10. ক্যাঙারু 11. বারো বছর 12. সীসা 13. মান মন্দিরের নাম 14. তামা 15. S. I. Unit

শব্দকুট / পার্থপ্রতিম তরফদার

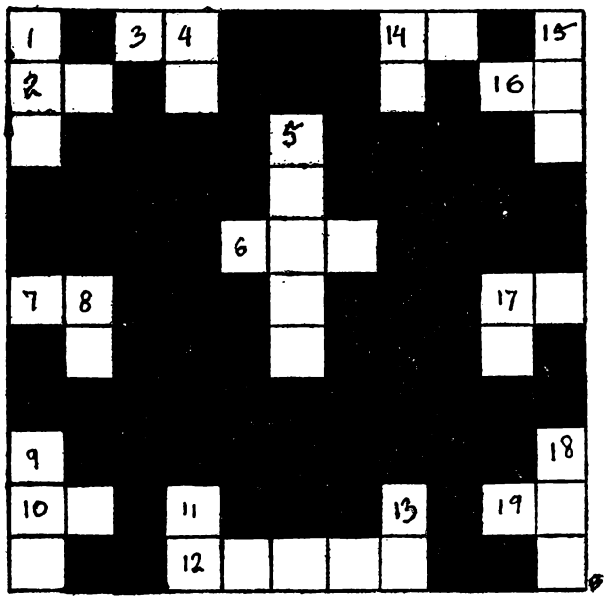

পাশাপাশি :—

2. —ই জীবন।
3. জিঙ্ক যে ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পিতল তৈরি করে।
6. কোন বস্তু যদি নির্দিষ্ট দিকে স্থান পরিবর্তন করে তাহলে তাকে কি বলে ?
7. বাজী তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
10. নিউটনের ১ম গতি সূত্র থেকে জাড্য ছাড়া আর কিসের সংজ্ঞা পাওয়া যায় ?
12. যে অধাতু ধ্বণাত্মক ধর্মী।
14. অক্সিজেনের পরমানু ক্রমাঙ্ক কত ?
16. এফ, পি, এস, পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক।
17. যে বস্তুর সাহায্যে তড়িৎ-শক্তি তাপ ও আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
19. একটি ধাতু কম্প।

উপর নিচ

1. স্প্রীং তুলার সাহায্যে বস্তুর কি মাপা হয় ?
4. এক প্রকার প্রাকৃতিক গ্যাস।
5. এশিয়া মহাদেশের প্রথম নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী কে ?
8. পরিমাণ যোগ্য যে কোন বিষয়কেই—বলে।
9. দ্রবণের মধ্যে যাহা কোন বস্তুকে দ্রবীভূত করে তাকে কি বলে ?
11. একটি চৌম্বক পদার্থ।
13. এফ. পি. এস পদ্ধতিতে ভরের একটি একক।

ভেবে ভেবে বল

শুভব্রত রায় চৌধুরী

[স্বর্গীয় বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসু স্মরণে]

1. গাছের বৃদ্ধি পরিমাপ করবার জন্য জগদীশ চন্দ্র বসু যে যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেছিলেন তার নাম ভেবে বল কোনটি। (ক) সিস্‌টোগ্রাফ; (খ) ক্রেসকোগ্রাফ; (গ) সিস্‌মোগ্রাফ।

2. সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে পড়বার সময় জগদীশ চন্দ্র এক জন বেলজিয়ান ফাদারের সান্নিধ্যে আসেন, তার নাম নীচের তিনটি নামের মধ্যে কোনটি ভেবে বল।

(ক) ফাদার হুয়ার্ট; (খ) ফাদার লা ফন্ট; (গ) ফাদার বনহোম।

3. জগদীশ চন্দ্র বসু সর্বপ্রথম বিলেতে গিয়েছিলেন কি জন্য ভেবে বল। (ক) ওকালতি করতে; (খ) ডাক্তারী পড়তে; (গ) প্রকৃতি বিজ্ঞান পড়তে।

4. (ক) 1884; (খ) 1898; (গ) 1902 এই তিনটি সালের মধ্যে কোন সালটিতে জগদীশচন্দ্র ভগিনী নিবেদিতার সংস্পর্শে আসেন।

5. নীচের ও পাশের ছবিতে জগদীশচন্দ্র বসুর তৈরী কয়েকটি যন্ত্রের আংশিক ছবি দেখান হোল; এদের নাম ভেবে বল।

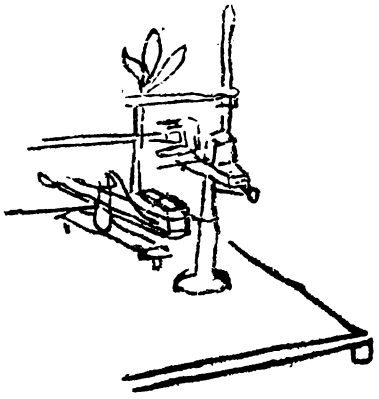

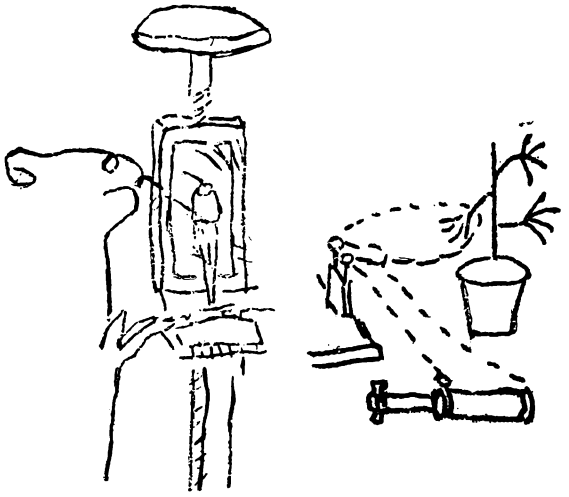

108, ডায়মণ্ডহারবার রোড, কলিকাতা-5

নিজে কর

কম্পাস যন্ত্র নির্মাণ

সুজয়কুমার দাস

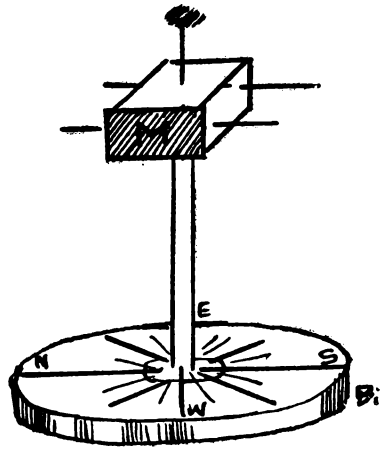

এখন যে কম্পাস যন্ত্রটি নির্মাণ করতে যাচ্ছ তা অত্যন্ত আনন্দ দান করবে তোমাদের। এই যন্ত্রটি তৈরী করতে সামান্য কয়েকটি ছোট খাট জিনিষ তোমাদের যোগাড় করতে হবে। সেগুলি তোমরা ঘরেই পেয়ে যেতে পার।

এই যন্ত্রটি তৈরী করবার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান গুলি উল্লেখ করলাম—

(i) একটি কাঠ বোর্ড (ii) একটি কাঠের মোটা চাকতি (iii) দুটি বড় সূচ (iv) একটি দন্ত চুম্বক (v) একটি খালি দেশলাইয়ের বাক্স (vi) $3\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা একটি সরু কাঠের দন্ড। (vii) একটি বোর্ড পিন। এইবারে নির্মাণ কৌশল বর্ণনা করছি। চিত্রের মত কাঠ বোর্ডটিকে বিভিন্ন দিক নির্দেশক দাগ কেটে কম্পাস কার্ড তৈরী কর। কম্পাস কার্ডটি একটি মোটা চাকতির উপর আঠা দিয়ে আটকে দাও। দন্ত চুম্বক দ্বারা দুই সূচকে চুম্বকিত করে নাও। এবার দেশলাই বাক্সের পাশ থেকে চুম্বকিত সূচ দুটিকে ঢুকিয়ে দাও যেন তাদের উভয়ের উত্তর মেরু একই দিকে থাকে। এবারে দেশলাই বাক্সটিকে কাঠের দন্তের মাথায় বোর্ডপিন দ্বারা আটকে দাও। কাঠের দন্তটিকে এখন চাকতির মাঝখানে বসিয়ে দাও। ব্যাস, যন্ত্র তৈরী শেষ। এখন এটাকে তুমি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করে দিক নির্ণয় করতে পার।

অঞ্জন গড়, শেওড়াফুলি, হুগলী।

জানা-অজানা

সঞ্জয় কুমার হালদার

1. বাড়ীতে ব্যবহৃত রেডিও গ্রাহক যন্ত্রকে আমরা 'ট্রানজিস্টার' বলে থাকি আবার কখনও উহাকে কেবল মাত্র রেডিও বলে থাকি—ইহা কি যুক্তি সংগত ?

—ইহা মোটেই যুক্তি সংগত নয়। কারণ গ্রাহক যন্ত্রটির নাম ট্রানজিস্টার নয়। এই যন্ত্রে ব্যবহৃত নানান অংশের মধ্যে কয়েকটি ট্রানজিসটারও থাকে। তাই যথার্থ বলতে গেলে আমাদের বলা উচিত ট্রানজিস্টার দিয়ে তৈরি গ্রাহক যন্ত্র। চলতি কথায় আমরা "রেডিও" বলে থাকি। ইহা ঠিক নয়। আমাদের বলা উচিৎ রেডিও গ্রাহক যন্ত্র (Radio receiver)।

2. পাঁঠার মাংসে প্রোটিনের শতকরা ভাগ কত ?

—পাঁঠার মাংসে প্রোটিনের শতকরা ভাগ 12 -21%

3. মাংস পেটে হজম হয়- অথচ পেটের কোষ হজম হয় না কি করে? পাচন নালীতে মাংস থাকা কালে পেপাসিন, ট্রিপসিন প্রভৃতি উৎসেচকের ক্রিয়ায় হজম হয়। প্রধানতঃ দুটি কারণে ঐ উৎসেচকগুলি পাকস্থলী ও তন্ত্রের কলাকোষকে হজম করিতে পারে না ঃ

(i) পাচন নালীতে, অম্ল ও ক্ষারীয় রসে পেপসিন ও ট্রিপসিনে কর্মক্ষম অংশ উন্মোচিত হয়।

(ii) অন্ত্রের অন্তঃগাত্রে অবস্থিত শ্লেষ্মা জাতীয় পদার্থের প্রলেপ অন্ত্র কোষকে রক্ষা করে।

4. আমাদের খাদ্য বস্তু হজম হতে কত সময় লাগে ?

—কম বেশী পাঁচ ঘণ্টা।

5. জীব দেহের সকল উৎসেচক কি জাতীয় ?

—জীবদেহের সকল উৎসেচক প্রোটিন জাতীয়।

6, আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগ সম্পন্ন কণার নাম কি ?

—আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগ সম্পন্ন কণার নাম 'ট্যাকিয়েন'।

7. জলের ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ কাকে বলে ?

—O°C হইতে 4°C উষ্ণতা পর্যন্ত জলের প্রসারণ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। ইহাকে জলের ব্যতিক্রম প্রসারণ বলে।

বসিরহাট 24-পরগণা।

প্রশ্নোত্তর

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

9. কাঁচা ডিম খাওয়া শরীরের পক্ষে উপকারী, না ক্ষতিকর ? খাদ্য ও ভিটামিনের মধ্যে পার্থক্য আছে কি ? ডালের প্রোটিন ও মাছের প্রোটিনের পার্থক্য কি ? অনুপ কুমার রায়, বালিধ্যা, বাঁকুড়া।

উত্তর ঃ কাঁচা ডিম খেলে উপকার হয়। কিন্তু কাঁচা ডিম সহজ পাক্য নয় এবং ডিমের মধ্যে রোগ সৃষ্টি জীবাণু থাকতে পারে। খাদ্য ও ভিটামিনে অবশ্যই পার্থক্য আছে। ভিটামিনের কোনো খাদ্য গুণ নেই। এগুলি অনুঘটকের কাজ করে। সেজন্যে শরীরের পক্ষে অপরিহার্য।

আমিষ প্রোটিন শরীরে সহজে বিশ্লেষিত হয় এবং অপেক্ষাকৃত সহজ পাচ্য।

10. মাথার চুল তেল দিলে কি কি উপকার হয় ? শোনা যায়, তেল দিলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে। এটা কি সত্যি ? সুমন দাস, কলকাতা-10

উত্তর ঃ চুলে তেল দিলে চুলের স্বাস্থ্য ভাল থাকে বলে প্রাচীন ধারণা। বর্তমানে মাথার চামড়ার কোন কোন রোগে চর্ম রোগ বিশেষজ্ঞরা চুলে তেল দিতে বারণ করেন। মাথা ঠাণ্ডা থাকার ধারণা বিজ্ঞান সম্মত নয়।

11. প্রশ্ন ঃ কাঁদলে বা এমনিতে চোখে জল পড়ে কেন ? এই জল কোথা থেকে আসে ?

সন্দীপ শর্মা ও অরিজিত রায়, শিলচর পলি টেকনিক কাছাড় আসাম

উত্তর ঃ চোখ অনবরতই সজল থাকে। না হলে শ্লৈষিক ঝিল্লি শুকিয়ে যাবে। চোখের ভিতর দিকের কোণে দুটি গ্রন্থি আছে—নাম 'ল্যাকরিম্যাল গ্ল্যাণ্ড'। এদের নিঃসৃত রসই হলো চোখের জল। কাঁদলে ঐ গ্রন্থিগুলি অত্যধিক উত্তেজিত হবার ফলে জল পড়ে।

12. মাঝে মাঝে নখের উপর সাদা রঙের মতো দাগ দেখা যায়। এগুলি কি ?

অলোক সেন, কালাকাটা, জলপাইগুড়ী

উত্তর ঃ সাধারণত যে দু একটা দাগ দেখা যায় সে গুলির গুরুত্ব নেই। বেশি দাগ বা নখের ক্ষয় হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

অধ্যাপক তুষারবাবু কোথায় ?

অর্ঘ সরকার

অধ্যাপক তুষারবাবু ! নামটা শোনো নি ? সেকি ? আচ্ছা, আচ্ছা, শোনো নি যখন খুলেই বলি।

অধ্যাপক তুষারবাবু ছিলেন ভারতের তথা পৃথিবীর পয়লা নম্বর বিজ্ঞানী। নিবাস বেলুড়। তবে হ্যাঁ ; তিনি বেলুড়ে থাকতেন না—না ভারতেও না, অ্যামেরিকাতেও না বা রাশিয়াতেও না। তিনি থাকতেন বড়ই নিঃসঙ্গ ভাবে আকাশে। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না—নিখোঁজ হয়েছেন।

তুষারবাবুর লেবরেটারিটা ছিল ভারতেরই এক পর্বতের অজানা গুহায়। একাই তিনি কাজ করতেন। তাঁর পরিবারের কোনো খোঁজই রাখতেন না। ক্ষুদ্র এই গবেষণাগার তাঁর সামান্য সামর্থের উওর প্রতিষ্ঠিত। তাই দরকারী জিনিস ব্যতীত বাহুল্যের কোনো বালাই নেই। তাঁর সেই ঘরে ছিল একটা অত্যাধুনিক শক্তিশালী আলট্রাভায়োলেট টিভি ; একটা ছোট একজন বসার উপযোগী জেট বিমান, যার গতি ঘণ্টায় 100 কিমির কিছু বেশী। একটি বিশেষ ভাবে তৈরী সৌর শক্তিতে চালিত জেনারেটার। অ্যালট্রা-ভায়োলেট টি. ভি. টি তাঁরই তৈরী। কিন্তু এ খবর এখনও কাউকে জানান নি। তাছাড়া ছিল একটা ছোট কমপিউটার আর ছিল কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি।

এই গবেষণাগারে কাজ শুরু করেছিলেন প্রায় চার বছর আগে। তবে এখন আর তিনি এখানে নেই তাতো আগেই বলেছি। মাস ছয়েক আগে তিনি সফল হয়েছিলেন। তাঁর দীর্ঘদিনের সাধনা সিদ্ধ হয়। তিনি গুহা থেকে বেরিয়ে তাঁর জেট প্লেনকে আকাশে উড়িয়েছিলেন পাঁচ মাস আগে। জেটের গতি 1000 কিমি/ঘণ্টা। আকাশে উড়ে দু-চার পাক খেয়েই তিনি জেনারেটারের 20 ফুটদীর্ঘ সৌর পাখা খুলে দিলেন। তারপর আরও বার দশেক পাক খেয়ে ঠিক ভারতের উপর এসে দাঁড়ান। এবার জেটের অভিমুখ পরিবর্তন করে আনলেন পশ্চিম দিকে। ভূ-পৃষ্ঠের 20 কিমি ওপর দিয়ে জেট যাচ্ছিল পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে।

পৃথিবীর উপর "ওজন" নামে একটা স্তর আছে। সেটা বড়ই উপকার করে অতিবেগুনী রশ্মিকে পৃথিবীতে প্রবেশ করতে না দিয়ে। কিন্তু সে দীর্ঘ দিন কাজ করে করে বুড়ো হয়ে গিয়েছে। জায়গায় জায়গায় দেখা দিয়েছে বড় বড় ফাটল। ভারতের উপরকার ভাটলটা সর্ববৃহৎ। এখানকার মতো পৃথিবীর কোথাও ওজন স্তর এতো পাতলা নয়।

এদিকে ওজনস্তর পাতলা হওয়ায় অধ্যাপক তুষারবাবুর হয়েছিল মহা সুবিধা। তিনি অ্যালট্রাভায়োলেট টি. ভির সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরিত বিভিন্ন গ্রহের স্বরূপ পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন।

তাঁর ডায়েরি থেকে জানতে পারলাম এই সময় (আকাশ ভ্রমণের সময়) খাদ্যের কোনো অসুবিধা হয়নি। যদিও তাঁর কাছে কোনো খাবার ছিল না। এটা কি করে সম্ভব ? পরে অবশ্য এই রহস্যের কিনারা পেলাম ডায়রির শেষ পাতায় গিয়ে। যাই হোক, তিনি লিখেছিলেন—

"আমার এই না খেয়ে বেঁচে থাকবার কথা হেঁয়ালী মনে হলেও সত্যিই আমি কোনো খাবার 'জেট'—এ নিয়ে যাই নি। এটা সম্ভব হয়েছিল ফ্লাইং সসারের জন্যে। আলফা সেনটরি থেকে আগত সেই মহাকাশযান একদিন আমার গুহার সামনে ল্যাণ্ড করে। দুঃখের বিষয় যান থেকে যখন সেই মানুষেরা বাইরে আসে অক্সিজেনের আধিক্যের জন্যে তারা তখনই বেলুন ফাটার মতো ফুলে উঠে ফেঠে গিয়ে মরে গেল। আমি অবাক হয়ে সেই দৃশ্য দেখছি এমন সময় কি একটা জিনিস আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে যানটা মহাশূণ্যে বিলীন হয়ে গেল। ঘোর কেটে গেলে সেই জিনিসটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছি। এমন সময় দেবতাদের আকাশবানী হওয়ার মতো কে যেন আমায় বলল 'ওটা ফুড মেকিং মেসিন বাই ফটো-সিন্থেসিস'। তারপর কার্যকলাপ বর্ণনা করে সেই আকাশবাণী থামল। এইবার সবাই নিশ্চয় বুঝতে পারছো কি করে আমি না খাবার নিয়েও বেঁচে আছি।"...

ব্যাস, এই পর্যন্ত। ডায়রি লিখেছিল কমপিউটার। মাস পাঁচেক আকাশে ঘুরেছিলেন। কিন্তু একদিন হঠাৎ কি এক অজানা কারণে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। বড়ই আক্ষেপের বিষয়! ভ্যাগিস তিনি তার আগে ডায়রিটা কমপিউটারের সাহায্যে টেলিপ্রিণ্টার করে পাঠান 'ক্যালকাটা স্পেস রিসার্চ ওরগানাইজেসানকে। কেউ কেউ বলেন দুপুর 12 টা বেজে 35 মিনিট 21·0528 সেকেণ্ডে আকাশে অপূর্ব রঙিন আলোর ঝিলিক দেখা যায়। সত্যি কিনা জানি না।

ডি. এন 180, দুর্গাপুর, বর্ধমান।

উষ্ণ বরফ

বিপ্লব সরকার

বিজ্ঞানীরা বুঝি বাহাদুরির সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। তারা ঠাণ্ডা বরফকেও না গলিয়ে গরম করে ছেড়েছেন। সাধারণভাবে আমরা জানি বরফ হল জলের কঠিন অবস্থা। জল জমে বরফ হয় 0°C তাপমাত্রায়। কিন্তু বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ব্রিজম্যান প্রথম বললেন প্রকৃতি সৃষ্ট এই বরফ ছাড়াও অন্য রকমেরও বরফ আছে। তৈরী করলেন তিনি উষ্ণ বরফ। যেন প্রকৃতির সৃষ্টির উপর টেক্কা দিলেন। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু কিছুই না। সাধারণ বরফকে 20,600 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে রাখলে উষ্ণতা এসে দাঁড়ায় 76°C। এই তাপমাত্রায় বরফ কিন্তু গলে যায় না। ভাবছ বুঝি এই বরফে হাত দিলে পুড়ে যাবে। মোটেই না। এই বরফকে আমরা স্পর্শ করতে পারি না। কেননা, এটা প্রচণ্ড চাপে ইস্পাতের পুরু দেওয়াল-বিশিষ্ট পাত্রে তৈরি করা হয়। এমন কি আমরা দেখতেও পারি না। কিন্তু আমরা এর ধর্ম সম্পর্কে পরোক্ষভাবে জানতে পারি। এই ধরনের বরফকে ব্রিজম্যান নাম দিলেন 'Ice No. 5'।

সাধারণ বরফ থেকে এই ধরনের বরফের অনেক পার্থক্য আছে। যেমন উষ্ণ বরফের ঘনত্ব সাধারণ বরফের থেকে বেশী হয়, এমন কি জলের থেকেও বেশী। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·05।

সবচেয়ে মজার পার্থক্য হল যে সাধারণ বরফ জলে ভাসে কিন্তু উষ্ণ বরফ জলে ডুবে যায়।

গুমা, সুকান্তপল্লী, 24-পরগনা

গত মাসের শব্দকূটের সমাধান

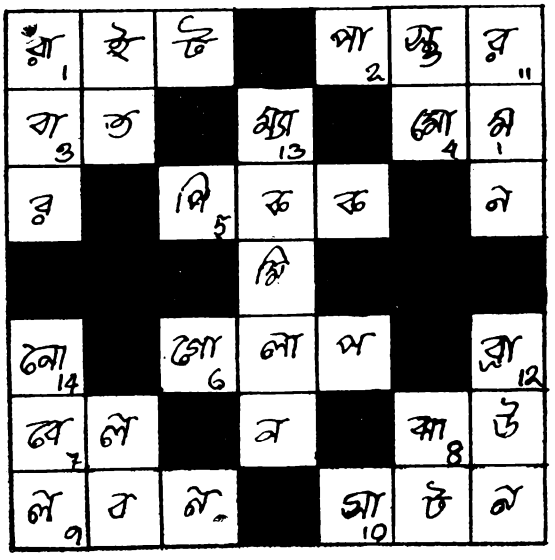

দুঃসংবাদ

সরল দে

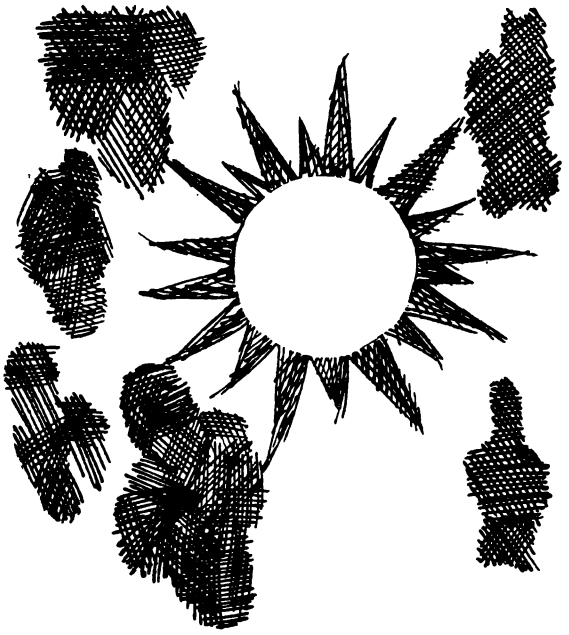

ডক্টর শিবনাথ অর্থাৎ শিবে
বলে, 'মামা, সুয্যিটা যাচ্ছে নিভে।'
শুনে মাথা ঘুরে যায়,
ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়,
চোখে নেই আলো আর জল নেই জিভে।

ফের বলে শিবনাথ, 'ঠাণ্ডায় জমে
যাবে ঐ সুয্যিটা ক্রমে ক্রমে ক্রমে।
আরো আছে, শোনো শোনো—
সন্দেহ নেই কোনো
ওজনেও ক্রমাগত যাচ্ছে সে কমে'।

দপ্‌দপ্‌ করে মাথা, দিই জলপটি,
ঘন ঘন জল খাই ঘটি ঘটি ঘটি।
শিবে বলে, 'নেই ভয়—
সূর্যের হতে লয়
কেটে যাবে বচ্ছর কোটি কোটি কোটি।'

35/1 পিয়ারীমোহন মুখার্জী স্ট্রীট, হাওড়া

আমার বাসস্থানের পরিবেশগত সমস্যা

পার্থ দাস

আজকাল সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিসন, বক্তৃতা, ব্যক্তিগত কথাবার্তা, সিনেমার পর্দায় একটি কথা বারংবার আমাদের কানে প্রবেশ করছে বা চোখে পড়ছে। কথাটি হল 'পরিবেশ দূষণ'। আমার মনে হয় শহরের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে এখন মুক্ত বায়ু ও বীজাণু মুক্ত জল পাওয়া যেতে পারে। আমি বাস করি হাওড়া জেলার ছোট্ট এক এলাকায়, নাম বেলগাছিয়া। এই জায়গাটিও পরিবেশ দূষণের প্রকোপ থেকে রক্ষা পায়নি। চাঁদেও যেমন কলঙ্ক থাকে ঠিক তেমনি আমাদের এই এলাকায় চুরি, ডাকাতি, খুন জখম না হওয়া সত্ত্বেও পরিবেশ দূষিত।

আমাদের এলাকার চারদিকে ছোট-বড় মাঝারি ঢালাই-কারখানা, ফ্যাক্টরী ভর্তি। এইসব কারখানার চুল্লী থেকে বিষাক্ত কালো ধোঁয়া আকাশ বাতাসকে আচ্ছন্ন করে দূষিত করে তুলেছে। তার ওপর সারাদিনই ডিজেল, পেট্রোল, কেরোসিন পুড়ে চলেছে এবং তার কালো ধোঁয়াতে পরিবেশ আরও দূষিত হয়ে উঠছে।

আমাদের এই এলাকার মধ্যে কয়েকটি ছোট বড় ড্রেন আছে। রাস্তার ধারের ড্রেনগুলি যদিও বা মাঝে মাঝে পরিস্কার হয় কিন্তু এলাকার ভিতরের কয়েকটি ড্রেন কোনদিনই পরিস্কার করা হয় না।

এখানে চার পাঁচটি পুকুরও বর্তমান। কিন্তু পুকুরের জল যা দুর্গন্ধ এবং রং যা কালো তাতে মানুষ রান্না-বান্না বা স্নান কেন, স্পর্শ করতেই ঘেন্না করে। সুতরাং এখানে আর এ দৃশ্য দেখা যায় না যে স্বচ্ছ সলিলের উপর হংস-হংসীর দল বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। এলাকাটির মধ্যে যদিও দু-একটি 'টিউব-ওয়েল' আছে কিন্তু অর্ধেক গুলিতে যে জল পাওয়া যায় তা পানীয়ের উপযোগী নয়।

আমাদের এই এলাকার পার্শ্ববর্তী বাসরাস্তাকে গলি বললেও ভুল বলা হয় না। সেই জন্য প্রতিদিন জ্যাম-জট লেগেই আছে। আর তার পরে তো আছে সেই সব যানবাহনগুলির কান ফাটানো গগনভেদী ইলেকট্রিক হর্ণের আওয়াজ। কোন পুজো বা শুভ-উৎসব লাগা মানেই মাইকের যতেচ্ছ ব্যবহার। রাতদিনই কানের কাছে জোর কদমে বেজে চলেছে মাইক। তারপর এখন দেওয়ালী উপলক্ষে শুধু নয়, সারা বছরই উৎসাহী যুবকেরা দুমদাম্ বাজী ফাটাচ্ছে। খেলায় জয় হয়েছে, বিসর্জন হচ্ছে কিংবা কোন মহাপুরুষের হয়ত জন্ম দিনের উৎসব পালিত হচ্ছে। ব্যাস্, লেগে গেল বাজী ফাটানোর ধুম।

চোখের সামনে থেকে আস্তে আস্তে সবুজ গাছপালা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে চারিদিকে তাকালে চোখে পড়ত সবুজ গাছপালা। আজ সেইসব গাছপালা কেটে ফেলে দিয়ে মানুষ গড়ে তুলছে অট্টালিকা, ফ্যাক্টরী। বাড়ী গুলো এত ঘিঞ্জী ভাবে তৈরী করা হচ্ছে যে বায়ু চলাচলের পথ প্রায় রুদ্ধ। সবুজ গাছপালা যতই কেটে ফেলা হচ্ছে পাখীদেরও আনাগোনা ততই কমে যাচ্ছে। আমাদের এই এলাকায় ফুল ফোটা বাগানের বড়ই অভাব। কারণ বাতাস এবং জল যা দূষনীয় তাতে ভাল বাগান তৈরী করতে বেশ কষ্ট এবং অনেক সময় এর পেছনে খরচ করতে হয়, যা ব্যস্ত মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সুতরাং সবুজ প্রকৃতিকে আর প্রাণ ভরে উপভোগ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই এলাকাটির বহু জায়গায় খাটা-পায়খানা আছে যা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আরও খারাপ করে তুলেছে।

প্রত্যেক মানুষই কামনা করে তার চারিদিকে থাকুক নির্মল বাতাস, আলোকজ্জ্বল পরিবেশ, বীজাণু মুক্ত জল। কিন্তু মানুষ পাচ্ছে তার ঠিক উল্টো জিনিষটা। অক্টোপাশ যেমন বাহু বিস্তার করে শিকারকে পিশে মারে, ঠিক তেমনি এই দুষিত পরিবেশ আস্তে আস্তে তার বাহুবিস্তার করে আমাদের পিশে মারছে। এই দুষিত পরিবেশের জন্যই আজ আমরা নানা রোগের শিকার হচ্ছি। পরিবেশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর কথা বলেছেন তাঁর একটি কবিতায়ঃ

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
চাই স্বাস্থ্য, চাই বল, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু।"

কিন্তু হায়! তা এ জীবনে কেন পরবর্তী জীবনেও পাওয়া আর সম্ভব নয়।

32/22, 'এল' রোড, বেলগাছিয়া, হাওড়া-৭

অষ্টম নিখিলবঙ্গ বিজ্ঞান ও শিল্প শিবির--৮৪

২২-২৬ শে জানুয়ারী– ১৯৮৪

।। আলিপুর চিড়িয়াখানা, অডিওভিস্যুয়াল সেণ্টার ।।

উক্ত বিজ্ঞান শিবিরে যোগদান করবার জন্য সকল স্কুল, কলেজ, বিজ্ঞান ক্লাব সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত প্রোগ্রামে যোগদান করবার জন্য সমগ্র পাঠমালা আহ্বান করা হচ্ছে।

ক) বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও মেধা অনুসন্ধান প্রতিযোগিতা

যে কোন ছাত্র, যুব, বিজ্ঞান কর্মী চার্ট ও মডেল সহ যোগদান করতে পারেন। দশটি স্বর্গীয় গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্মৃতি পুরস্কার। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। ৩ দিনের বিনামূল্যে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। একটি ছাত্র/শিক্ষক প্রত্যেক মডেল পিছু থাকতে পারেন. সংক্ষিপ্ত বিবরনী পাঠান। প্রবেশ মূল্য নেই। ২২শে জানুয়ারী সকাল ১০-১২টার মধ্যে মডেল সহ উপস্থিত থাকতে হবে।

খ) বিজ্ঞান কুইজ ও রচনা প্রতিযোগিতা

যে কোন স্কুল কলেজের ছাত্র, ছাত্রী যোগদান করতে পারেন। প্রবেশ মূল্য– ১ টাকা। প্রতিযোগিতায় নাম দেবার সময়—১০—১টা (২৪শে জানুয়ারী '৮৪) বেলা ১২টায়, তিনটি স্বর্গীয় জগদীশচন্দ্র বসু স্মৃতি পুরস্কার।

গ) একদিনের পরিবেশ উদ্যোগ কোর্স

ছাত্র, শিক্ষক, যুব, গ্রামের কুমোর, চাষীভাই ও কুটীর শিল্প উদ্যোগীরা এই কোর্সে যোগদান করতে পারেন। ২৫শে জানুয়ারী '৮৪ সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত। প্রবেশ মূল্য— ২৫ টাকা আহারাদি সমেত ও সহায়ক বইপত্র, পেন দেওয়া হবে। মনি অর্ডারে টাকা পাঠাবেন। পেছনে নাম ও ঠিকানা লিখবেন।

ঘ) বিজ্ঞান পুস্তক/পত্রিকার গ্রন্থাগার ও প্রকাশকদের পুরস্কার

২ কপি করে বই/পত্রিকা ২৫শে ডিসেম্বর '৮৩ মধ্যে পাঠাতে হবে।

স্বর্গীয় রবীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য স্মৃতি পুরস্কার।

যোগাযোগ করুন :—**সম্পাদক, দা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল**

১০৪, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা-৭০০০০৮

ফোন : ৭৭-২৩১২

। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় না করতে পারলে মানুষ সচেতন হবে না ।

বেশ তো! আমাদের ১১,০০০ ইঞ্জিনের মধ্যে বেছে নাও কোনটি তোমার পছন্দ, —এদের মধ্যে ৮,০০০ টিরও বেশি হল স্টীম ইঞ্জিন, ২,০০০-এর কিছু বেশি ডিজেল আর প্রায় ১,০০০ হল বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন। এছাড়াও রয়েছে কয়েকশ 'এম্' কোচ। এখন সারা দেশ জুড়ে ৭৫,০০০ কিমি রেলপথে ৭,০০০-এরও বেশি স্টেশন আছে। তুমি যখন বড় হবে তখন দেখবে স্টেশনের সংখ্যা আরও কত বেড়ে গেছে, বেড়ে গেছে রেলপথের দৈর্ঘ্য। তাছাড়া, তখন আরও দ্রুতগামী ডিজেল আর বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের সংখ্যাও অনেক বেড়ে যাবে। আমরা কি এইসব ইঞ্জিন এখন এ দেশেই তৈরি হচ্ছে এবং কিছু কিছু রপ্তানীও করছি আমরা।

কিন্তু শুধু রেলগাড়ী চালাবে কেন, সারা রেলওয়েকে চালানোর দায়িত্বও একদিন তোমাদের হাতে এসে পড়বে। দেশকে আরো দ্রুত প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে—এ তো তোমাদেরই কাজ। তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠ—দেখবে কত মজার কাজ তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

পূর্ব রেলওয়ে

RNo 37390/81 KISHORE JAN-BIJNAN 3rd year, December 1983 Regd NO WBCC/50

ছোটদের জন্য বই একশ বই

কিশোর ক্ল্যাসিকস্

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ভেপান্তর—২০·০০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কিশোর অপু—২০·০০
অপুর ছেলেবেলা.—১০·০০
ছোটদের অপরাজিত—১০·০০
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ছোটদের কাজল—১০·০০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
ছোটদের সন্দীপন পাঠশালা—৮·০০
বুদ্ধদেব বসু ॥ অপরূপ রূপকথা—১০·০০
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ বাংলার ডাকাত ১-৪—৩২·০০
মহিম ডাকাত—১০·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ ঘনাদা বিচিত্রা—২০·০০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ টেনিদার অভিযান—২০·০০

রহস্য, রোমাঞ্চ, ভৌতিক গল্প

হেমেন্দ্র কুমার রায় ॥ ভৌতিক গল্প—১০·০০
মোহনপুরের শ্মশান-৫·০০ যক্ষপতির রত্নপুরী-৬·০০
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল ॥
কিশোর রহস্য গল্প—৮·০০
কিশোর রোমাঞ্চ গল্প—৮·০০
কিশোর গোয়েন্দা গল্প—১০·০০
দীনেন্দ্রকুমার রায় ॥ যখের আসন—৮·০০
আনন্দ বাগচী ॥ মুখোশের মুখ—৮·০০

বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের গল্প

লীলা মজুমদার ॥ কল্প-বিজ্ঞানের গল্প—১৫·০০
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ লুপ্তধন—৮·০০
তুষারলোকের রহস্য—৮·০০ মেঘনাদ—১০·০০
অদ্রীশ বর্দ্ধন ॥ কিশোর সায়েন্স ফিকশ্যান—১৫·০০

ছবি ও ছড়া

যোগীন্দ্রনাথ সরকার ॥ খুকুমণির ছড়া—১০·০০
অন্নদাশঙ্কর রায় ॥ হট্টমালার দেশে—৫·০০

পশুপাখি বনজঙ্গলের গল্প

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ পশুপাখী কীটপতঙ্গ ৮·০০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার ॥ পশুপক্ষী—২০·০০
বনে জঙ্গলে—২০·০০
অজয় হোম ॥ বাংলার পাখি—২০·০০
অমিতাভ চক্রবর্তী ॥ ছোটদের বাঘের গল্প—৮·০০
কেনেথ আণ্ডারসন ॥ বাঘের গর্জন—১৫·০০
মানুষখেকোর বিভীষিকা—১৫·০০

ফ্যাণ্টাসী ও মজার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা—৮·০০
ঘনাদার জুড়ি নেই—৮·০০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ চারমূর্তি—৮·০০
ঝাউবাংলোর রহস্য—৮·০০ কম্বল নিরুদ্দেশ—৬·০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ হাতিচোর—৮·০০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ৮·০০
রামধনু—১০·০০ ছোটদের মজার গল্প—৬·০০

সচিত্র জ্ঞানবিজ্ঞান

অমরনাথ রায় ॥ সংখ্যা নিয়ে খেলা—৮·০০
জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা—৫·০০
সায়েন্স ক্যুইজ—১০·০০
সমরজিৎ কর ॥ নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী—১৫·০০
সমুদ্রের সম্পদ—৮·০০
স্বপন বুড়ো ॥ বুক অব নলেজ—১০·০০
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ রোবোট এল কেমন করে ?
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥
বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার—৬·০০
সিদ্ধার্থ ঘোষ ॥
স্যাম লয়েড ও ল্যুইস ক্যারোলের ধাঁধা—১০·০০
অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক ৬·০০

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

৮/১ এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিণ্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দুইটাকা পঞ্চাশ পয়সা।
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : লক্ষ্মীনারায়ণ প্রসেস ১৯ গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলি-৬